দারুল হাদীস সিরিজ

১

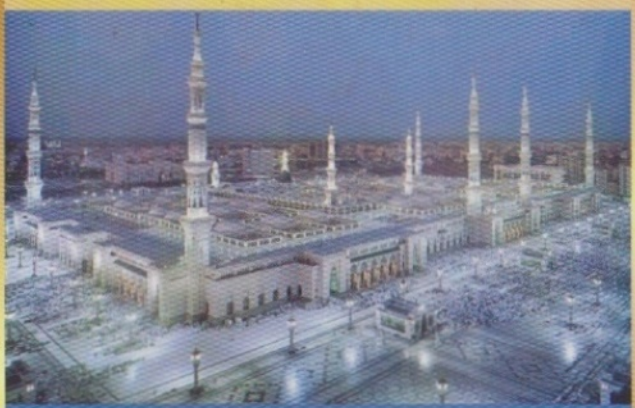

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দারসুল হাদীস সিরিজ

১

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রকাশকাল জুন, ২০১৪
আষাঢ়, ১৪২১
শা'বান, ১৪৩৫

প্রচ্ছদ জাহাঙ্গীর আলম

মুদ্রণ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় আশি টাকা মাত্র

Darsul Hadith Series : Vol-I Written & Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition June 2014 Price Taka 80.00 only.

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

اَلْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَعَلَى مَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ وَنَهَجَ مَنْهَجَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدُ :

স্বনামধন্য মাসিক ইসলামী গবেষণা পত্রিকা 'মাসিক পৃথিবী' তে জানুয়ারি ২০১২ থেকে আমরা নিয়মিত একটি করে হাদীসের দারস লিখে আসছি। বেশ কয়েকজন সম্মানিত পাঠকের পরামর্শের প্রেক্ষিতে আমরা সেসব দারসের সিরিজ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সিরিজের প্রথম খণ্ড বিধায় এটিতে আমরা প্রথমেই হাদীস সংক্রান্ত কিছু মৌলিক বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশ করেছি। কেননা হাদীসের দারস প্রদানকারী ও দারস শ্রবণকারী উভয়ের জন্যই বিষয়গুলো সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রতিটি হাদীসেই সরল অনুবাদের পর রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং হাদীসের বিষয়বস্তু, ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা শেষে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আলোকপাত করেছি। রাবীর পরিচয় দিতে গিয়ে কয়েকজন সাহাবীর জীবনী একাধিকবার এসেছে। এক্ষেত্রে পাঠককে পিছনের দিকে ইঙ্গিত না করে আমরা তা যথাস্থানে পূণরায় উল্লেখ করেছি। ফলে বইয়ের কলেবর একটু বৃদ্ধি পেলেও পাঠকের জন্য তা সুবিধাজনক হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। যেসব হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে আমরা প্রথমত: সাহীহাইন অথবা অন্য কোন সাহীহ গ্রন্থ এবং তারপর সুনানের গ্রন্থ থেকে চয়ন করেছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ গ্রন্থে কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পাঠকদের কাছে এমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাদের জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

ইসলামী শারী'আতের দ্বিতীয় প্রধান উৎস তথা আলহাদীসের সিরিজ দারস প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আশা করছি যে, এর উসীলায় তিনি আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করবেন।

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

www.pathagar.com

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا}

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে
তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।
(আলকোরআন : সূরা আল হাশর, ৫৯:৭)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ক. হাদীস সংক্রান্ত কিছু মৌলিক বিষয়

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	হাদীসের পরিচয় ও সংজ্ঞা	১১
২	হাদীসের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা	১২
৩	হাদীসের সমার্থক পরিভাষাসমূহ	১৩
৩.১	'খাবর'	১৩
৩.২	'আসার'	১৩
৩.৩	'হাদীসে কোদসী'	১৩
৪	ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব	১৪
৪.১	শারী'আতের বিধান প্রণয়নে হাদীসের গুরুত্ব	১৫
৪.২	আলকোরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব	১৫
৪.৩	ইসলামী শারী'আতের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব	১৬
৫	হাদীসের শ্রেণিবিভাগ	১৮
৫.১	মৌলিক সংজ্ঞার আলোকে/ মাতানের দিক থেকে হাদীসের শ্রেণিবিভাগ	১৮
৫.১.১	কাওলী বা বর্ণনামূলক হাদীস	১৮
৫.১.২	ফি'লী বা কর্মমূলক হাদীস	১৮
৫.১.৩	তাকরীরি বা অনুমোদনমূলক হাদীস	১৮
৫.২	মূল উৎসের দিক দিয়ে/ সানাদের দিক থেকে হাদীসের শ্রেণিবিভাগ	১৯
৫.২.১	মারফূ' হাদীস	১৯
৫.২.২	মাওকূফ হাদীস	১৯
৫.২.৩	মাকতূ' হাদীস	১৯
৫.৩	বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্যতার প্রেক্ষিতে/ রাবীদের সংখ্যা অনুযায়ী হাদীসের শ্রেণিবিভাগ	১৯

www.pathagar.com

৫.৩.১	মুতাওয়াতির হাদীস	১৯
৫.৩.২	আহাদ হাদীস	১৯
৫.৪	সানাদের বিচ্ছিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতা অনুসারে/ রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে হাদীসের শ্রেণিবিভাগ	২০
৫.৪.১	মুত্তাসিল হাদীস	২০
৫.৪.২	মুনকাতি' হাদীস	২০
৫.৫	সানাদের বিশুদ্ধতা ও হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে/ রাবীর গুণ অনুযায়ী হাদীসের শ্রেণিবিভাগ	২০
৫.৫.১	সাহীহ্ হাদীস	২০
৫.৫.২	হাসান হাদীস	২১
৫.৫.৩	যা'ঈফ হাদীস	২১
৬	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনুপাতে রাবীগণের প্রকার	২১
৭	হাদীস শাস্ত্রের কতক পরিভাষা	২১
৮	সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন	২৩
৯	হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণ	২৪
১০	হাদীস সংকলনের ইতিকথা	২৬
১০.১	হাদীস সংকলনের প্রথম যুগ	২৬
১০.২	হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ	২৬
১০.৩	হাদীস সংকলনের তৃতীয় যুগ	২৭
১০.৩.১	তৃতীয় যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক ও তাঁদের সংকলনসমূহ	২৭
১০.৪	হাদীস সংকলনের চতুর্থ যুগ	২৮
১১	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে হাদীস সংকলন	২৯
১২	হাদীস সংকলনের ব্যাপারে দ্বৈত বর্ণনার সমাধান	৩০
১৩	হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা	৩১
১৪	কে, কখন প্রথম এ উদ্যোগ নেন	৩১
১৫	হাদীস সংকলনে বিভিন্ন এলাকায় প্রথম যাঁরা অবদান রাখেন	৩২

www.pathagar.com

খ. দারসুল হাদীস

হাদীস নং	হাদীসের বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
১	নিয়্যাতের গুরুত্ব	৩৩
২	মুনাফিকের আলামত	৪৫
৩	কাকে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে	৫১
৪	সময়মত সালাত আদায়ের অপরিহার্যতা	৫৮
৫	সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গ	৬৯
৬	রামাদানুল মুবারাকের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য	৭৬
৭	রাসূলের প্রতি দরুদ পাঠ ও মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ	৮৪
৮	আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের তাৎপর্য	৯৩
৯	গর্ব ও অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম	১০৩
১০	পাঁচটি বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত	১১২
১১	বেপর্দা ও অশ্লীলতার ভয়াবহ পরিণতি	১২৩
১২	আল্লাহর পথে সময় অতিবাহিত করার গুরুত্ব	১২৮
১৩	অন্যায় ও অপকর্ম রোধে মু'মিনের করণীয়	১৩৬
১৪	দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহীতা	১৪৪
১৫	কনে নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৫২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাদীস সংক্রান্ত কিছু মৌলিক বিষয়

১. হাদীসের পরিচয় ও সংজ্ঞা

মহান রাব্বুল 'আলামীন যিনি সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা তিনি 'কাদীম' (قَدِيْم) তথা অবিনশ্বর। আর সমস্ত সৃষ্টিজগত হলো 'হাদিস' (حَادِث) বা নশ্বর। কাদীম এবং হাদিস হলো পরস্পর বিরোধী যার একের সঙ্গে অপরের কোনই মিল নেই। আর এ কারণেই স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে কোন কিছু প্রদান এবং গ্রহণ হয়ে উঠে অসম্ভব। যেমন মহাগ্রন্থ আলকোরআনে এসেছে: (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا) "তারপর যখন তাঁর রব পাহারের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন"।[১]

অবশ্য মহান আল্লাহ এও করতে সক্ষম যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কোন মানুষকে এ ক্ষমতা দেন যে, তিনি এ নশ্বর ও অবিনশ্বর তথা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে মধ্যস্থতা বিধান করবেন। অবশেষে তিনি তাই করলেন। কেননা স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্পর্কই হলো দাসত্বের সম্পর্ক। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হলেন আমাদের মনিব। আর আমরা হলাম তাঁর দাস। মনিবের কাজ হলো দাসকে আদেশ নিষেধ করা। আর দাসের কাজ হলো মনিবের আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলা। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব! কারণ সে তো তার স্রষ্টার নির্দেশনাগুলো শুনতেও পারে না, বুঝতেও পারে না।

আর তাই মহান প্রভু মানুষদেরই ভিতর থেকে যুগে যুগে একদল মানুষকে বাছাই করলেন যাঁরা তাঁর নির্দেশনাগুলো শুনতে এবং বুঝতে পারে। তাঁদের এই বিশেষ যোগ্যতাটির নাম হলো (Prophethood) বা 'নাবুওয়াত'। আর যাঁদেরকে তিনি এই বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী বানান তাঁরাই হলেন (Prophet) বা নাবী। এসব সম্মানিত নাবীদের ভিতর থেকে আবার তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের জন্য হিদায়াত ও জীবন বিধান দিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাবী এবং রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নাবী এবং রাসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অনেক সময়

---

১. আলকোরআন: সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৪৩

www.pathagar.com

জিবরীল আমীন ভরা মাজলিসেই ওহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসতেন। আর তিনি তাঁর থেকে সে ওহী গ্রহণ করতেন। অথচ পাশে থেকে সাহাবীরা জিবরীল (আ.) কে দেখতেও পেতেন না; কী ওহী নাযিল হলো তা শুনতেও পেতেন না। আর এ রাসূলকে প্রেরণের উদ্দেশ্য জানিয়ে আলকোরআন বলছে:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

"তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এ দীনকে (মানবরচিত) অন্যান্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন"।[২]

মহান প্রভু তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করলেন এই পরিপূর্ণ হিদায়াত ও সত্য দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য। আর সাথে সাথে তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন তাঁরই নি'আমাত প্রচার করতে। আর এ নি'আমাতের প্রচারকেই নাম দিলেন হাদীস করে। কোরআন বলছে: (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) "আর আপনার পালনকর্তার নি'আমাতের কথা প্রকাশ করুন"।[৩] কাজেই হাদীস শব্দটি মুহাদ্দিসগণের তৈরি করা নয়; বরং মহাগ্রন্থ আলকোরআন থেকেই এর উৎপত্তি। পরবর্তীকালে এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নিম্নে আমরা সেই পরিভাষাটি নিয়েই আলোচনার প্রয়াস চালাব।

২. হাদীসের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা:

সাধারণভাবে হাদীস হলো এমন জ্ঞান যার দ্বারা নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও তাঁর অবস্থা জানা যায়। আর অভিধানে হাদীস (حَدِيْث) শব্দটি 'জাদীদ' (جَدِيْد) বা নতুন অর্থে ব্যবহৃত। এর বহুবচন হলো 'আহাদীস' (أحاديث)। আর হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো:

هُوَ مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ وَصْفٍ خَلْقِيٍّ أَوْ خُلُقِيٍّ.

---

২. আলকোরআন: সূরা আলফাতহ, ৪৮:২৮

৩. আলকোরআন: সূরা ওয়াদ্ দোহা, ৯৩:১১

www.pathagar.com

যেসব কথা, কাজ, সমর্থন এবং সৃষ্টিগত ও চরিত্রগত গুণাগুণকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্পর্কিত করা হয় তাই হাদীস।[৪]

৩. হাদীসের সমার্থক পরিভাষাসমূহ:

হাদীসের ন্যায় আরো কিছু ইসলামী পরিভাষা রয়েছে যা এর সমার্থক বা কাছাকাছি অর্থের। যেমন-

৩.১. 'খাবর' (خَبَر)। খাবর এর শাব্দিক অর্থ হলো 'আন্ নাবা' (اَلنَّبَأ) বা সংবাদ। আর পরিভাষায় 'খাবর' এর সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ বিদ্যমান। যেমন-

কেউ কেউ বলেছেন যে, খাবর হাদীসের সমার্থবোধক। অর্থাৎ পূর্বে হাদীসের যে সংজ্ঞা দেয়া হলো খাবরও তাই। অপরাপর কেউ কেউ বলেন, খাবর হলো হাদীসের পুরোপুরি বিপরীত। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা যা এসেছে তা হাদীস। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে যা এসেছে তা খাবর। এ হিসেবে হাদীস বলতে শুধু মারফূ' হাদীসকেই বুঝাবে। আর খাবর বলতে মাওকূফ এবং মাকতূ' হাদীসকে বুঝাবে। এ কারণেই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতকে নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদেরকে 'মুহাদ্দিস' এবং ইতিহাস নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদেরকে 'আখবারী' বলা হয়।

আবার কারো কারো মতে, হাদীস এবং খাবর এর মধ্যে 'আম খাস মুতলাক' (عَام خَاص مُطْلَق) এর সম্পর্ক। অর্থাৎ একটি 'আম এবং আরেকটি খাস। খাবর হলো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবী উভয় থেকেই এসেছে। আর হাদীস হলো যা কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এসেছে। এ হিসেবে মাওকূফ হাদীসও খাবর। কাজেই সকল হাদীসই খাবর কিন্তু সকল খাবর হাদীস নয়।

৩.২. 'আসার' (أَثَر)। আসার এর শাব্দিক অর্থ হলো (بَقِيَّةُ الشَّيْئ) কোন বস্তুর অবশিষ্টাংশ বা চিহ্ন। আর পরিভাষায় সাহাবী এবং তাবি'ঈদের যেসব কথা এবং কাজ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোই আসার। আবার কারো কারো মতে, আসারও হাদীসেরই সমার্থবোধক। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্ম ও বাণীকেও আসার বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩.৩. 'হাদীস কোদসী' (حَدِيْث قُدْسِي)। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'হাদীস কোদসী' হলো-

---

৪. ড. মাহমূদ আত্ তাহ্হান, তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস, পৃ- ১৫

www.pathagar.com

هُوَ مَا نُقِلَ إِلَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ إِسْنَادِهِ إِيَّاهُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সরাসরি মহান রাব্বুল 'আলামীন থেকে যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলোই 'হাদীস কোদসী'।[৫] যেমন:

عن أبي ذَرٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى عن اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قال يا عِبَادِي إِنِي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلا تَظَالَمُوا.

আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যা তিনি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলেছেন: হে আমার বান্দাহগণ! আমি আমার নিজের জন্য যুলম করাকে হারাম বানিয়ে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝেও তা হারাম বানিয়েছি। অতএব, তোমরা পরস্পরের উপর যুলম করো না"।[৬]

উক্ত হাদীসে 'হে আমার বান্দাহগণ' বলে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের একটি উক্তিকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর এই উক্তিটি তাঁর ভাষায় বর্ণনা না করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর এরূপ কোন উক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় বর্ণিত হলে তাকেই 'হাদীস কোদসী' বলা হয়। আরবী 'কোদস' শব্দ থেকে এসেছে 'কোদসী'। 'কোদস' শব্দের অর্থ হলো পবিত্র। মহান আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার দিকে সম্পর্কিত করে এসব হাদীসকে 'হাদীস কোদসী' বলা হয়। কেননা এগুলো মূলত: মহান আল্লাহরই বাণী। কিন্তু সরাসরি তা আল্লাহর দেয়া শব্দে বর্ণনা না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনি:সৃত শব্দে বিবৃত হয়েছে। এ কারণেই এটি আলকোরআন থেকে আলাদা হলো।

অন্য কথায়, যে ওহীর ভাষা ও ভাব উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাই হলো আলকোরআন। আর যার ভাব আল্লাহর কিন্তু ভাষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর, তাকেই বলা হয় 'হাদীস কোদসী'।

৪. ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব:

ইসলামী শারী'আতে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। আলকোরআনের পরেই আল হাদীসের স্থান। আলকোরআন ইসলামী আইনের প্রথম এবং প্রধান উৎস। আর আলহাদীস হলো ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। তবে হাদীস ইসলামী আইনের

---

৫. ড. মাহমূদ আত-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ- ১২৭।

৬. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৯৪, হাদীস নং- ২৫৭৭

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উৎস হলেও এটি প্রথম উৎস তথা আলকোরআনের পরিপূরক। আলকোরআনের অনেক বিধান হাদীসের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী। নিম্নে আমরা হাদীসের গুরুত্বের কতিপয় দিক তুলে ধরছি।

৪.১. শারী'আতের বিধান প্রণয়নে হাদীসের গুরুত্ব:

হাদীস নিজেই শারী'আতের বিধি-বিধান প্রবর্তন ও প্রণয়ন করে। শুধু আলকোরআনের বিধানের ব্যাখ্যা নয় বরং হাদীস নিজেই শারী'আতের বিভিন্ন নতুন বিধান প্রণয়ন করে। এ কথার স্বীকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ নিজেই আলকোরআনে ঘোষণা করেছেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.

"আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা নিয়ে নাও এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো"।[৭]

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া সকল বিষয়কে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে এবং তাঁর যাবতীয় নিষেধকে পরিহার করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেবল আলকোরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে নয় এমনিতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে যা যা এসেছে তা সবই শারী'আতের দলীল এবং মুসলিমদের জন্য অবশ্যই পালনীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য। তাছাড়া রাসূলের আদেশ ও নিষেধের মধ্যে সমন্বয়ও সাধন করতে হবে। অর্থাৎ কেবল আদেশগুলো মেনে চললাম কিন্তু নিষেধ পরিহার করলাম না- এটি যেমন চলবে না, তেমনি শুধু নিষেধ বর্জন করলাম কিন্তু আদেশ পালন করলাম না- তাও হতে পারে না।

৪.২. আলকোরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীসের গুরুত্ব:

মহাগ্রন্থ আলকোরআন যদিও মহান আল্লাহর বাণী এবং ইসলামী শারী'আতের প্রধান উৎস, তথাপি এর বিধিবিধান বহুলাংশে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

এক. আলকোরআনে যা ব্যাপকার্থে বা মোটামুটিভাবে কিংবা অস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে তার বিশ্লেষণ ও

---

৭. আলকোরআন: সূরা আল হাশর, ৫৯:৭

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে আর আলহাদীসই হলো আলকোরআনের গ্রহণযোগ্য ও উত্তম ব্যাখ্যা।

দুই. আলকোরআনে যেসব তত্ত্বের সমাহার রয়েছে, এগুলোর প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক ব্যাখ্যা আলহাদীসেই দেয়া হয়েছে। আলকোরআনে যেসব নীতিকথার সমাহার ঘটেছে সেগুলোর বাস্তব দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসেই বিদ্যমান রয়েছে। সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন- সুন্নাত না হলে আমরা কেউ কোরআন বুঝতাম না।

তিন. হাদীস হলো কোরআনের পরিপূরক দলীল। কোরআনের প্রতিটি নির্দেশ যেমন সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান দেয়, হাদীসও তেমনি সমগ্র মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দেয়। আলকোরআনের ন্যায় আলহাদীসও তাই কিয়ামাত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে এবং আগত মানবতার জন্য হিদায়াতের দিশা দিয়ে যাবে। বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক উক্তি থেকে একথারই স্পষ্ট নিদর্শন মিলে। তিনি সেখানে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنِّيْ قَدْ خَلَفْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا مَا أَخَذْتُمْ بِهِمَا أَوْ عَمِلْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّتِيْ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মাঝে আমি দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা ততদিন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন এ দু'টো জিনিসকে আকড়ে ধরে থাকবে অথবা এ দু'টোর আলোকে চলবে। আর তা হলো- আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত।[৮]

৪.৩. ইসলামী শারী'আতের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীসের গুরুত্বঃ

হাদীস হলো ইসলামী শারী'আতের বিধিবিধানের প্রায়োগিক দিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ইসলামী শারী'আহকে প্রতিপালন করে যা দেখিয়ে গেছেন তাই হাদীস। কখনো কখনো তিনি কোন কোন বিধান সাহাবীদেরকে বাস্তবে শিক্ষা প্রদান করেছেন। সঠিকটি শিখাবার জন্য কখনো বা

---

৮. আল মুসতাদরাক 'আলা আস্ সাহীহাইন, কিতাবুল 'ইলম, খ. ১, পৃ. ১৭২, হাদীস নং- ২০১২৪

www.pathagar.com

একই কাজ বার বার করিয়েছেন। আবার কখনো তাদেরকে শিখাবার উদ্দেশ্যে তাদের সামনে নিজে তা বাস্তবে করেছেন। এমনকি কখনো কখনো তিনি নিজে বিভিন্ন বিধান পালন করার পর বলেছেন যে, তোমরা তা এভাবে পালন করবে, যেভাবে আমাকে পালন করতে দেখছ। যেমন- নামায আদায়ের ব্যাপারে তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীস:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ؛ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন: তোমরা সেভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখছ। আর যখন নামাযের সময় হয়ে যায় তখন তোমাদের একজন যেন আযান দেয়। অত:পর যে তোমাদের মধ্যে বড় সে যেন তোমাদের ইমামাতী করে । (মুত্তাফাকুন 'আলাইহি)।[৯]

আবার হাজ্জের ব্যাপারে তিনি বলেছেন: (خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ) "তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হাজ্জের নিয়মনীতিগুলো জেনে নাও"[১০] ইত্যাদি।

এমনিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। জীবনের এই সমস্ত দিককে বর্জন করে তিনি কখনো বৈরাগ্যতা অবলম্বন করেননি। মানুষের স্বাভাবিক জীবনের বাস্তবতা বিবর্জিত কোন কিছুই আমরা তাঁর জীবনে লক্ষ্য করি না। তিনি ছিলেন আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভাই, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ প্রতিবেশী। ছিলেন আদর্শ ব্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান চাকুরীজীবি। আবার ছিলেন বিচক্ষণ সমরনায়ক ও আদর্শ রাষ্ট্রপতি। তাই আমরা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর মধ্যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। আর এই অর্থেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন তথা তাঁর হাদীস সমূহ ইসলামী শারী'আতের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য।

---

৯. মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ২১৫, হাদীস নং- ৬৮৩

১০. সুনানুল বাইহাকী আল কুবরা, খ. ৫, পৃ. ১২৫, হাদীস নং- ৯৩০৭

www.pathagar.com

৫. হাদীসের শ্রেণীবিভাগঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা যেমন হাদীস তেমনি তাঁর কাজ ও মৌন সম্মতিও হাদীস হিসেবে গণ্য। আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যেসব কথা, কাজ ও সমর্থন সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন সেগুলো যেমন হাদীস তেমনি তাবি'ঈদের বর্ণিত তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনগুলোও হাদীস। একইভাবে বেশিসংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিতগুলো যেমন হাদীস তেমনি অল্পসংখ্যকদের বর্ণিতগুলোও হাদীস হিসেবেই গণ্য। উপরোক্ত বিভিন্ন দিক বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের বিভিন্ন ধরনের প্রকরণ হয়ে থাকে। যেমনঃ

৫.১. মৌলিক সংজ্ঞার আলোকে / মাতানের দিক থেকে হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

৫.১.১. কাওলী (قَوْلِي) বা বর্ণনামূলক হাদীসঃ যেসব কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় তদীয় সাহাবী ও পরবর্তী উম্মাতদের জন্য বলে গেছেন, তাই কাওলী বা বর্ণনামূলক হাদীস। যেমন- কোন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম .... বলেছেন। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা ..... কথা বলতে শুনেছি। ইত্যাদি।

৫.১.২. ফি'লী (فِعْلِـــي) বা কর্মমূলক হাদীসঃ যেসব কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় করে গেছেন, তাই ফি'লী বা কর্মমূলক হাদীস। যেমন- কোন সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ..... করেছেন। অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা ..... কাজ করতে দেখেছি। ইত্যাদি।

৫.১.৩. তাকরীরি (تَقْرِيْرِي) বা অনুমোদনমূলক হাদীসঃ সাহাবীদের যে সকল কথা ও কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমর্থন প্রমাণিত হয়েছে, তাই তাকরীরি বা অনুমোদনমূলক হাদীস। যেমন- সাহাবীদের কথা "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতিতে ..... করতাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কোন নিষেধ করেননি"। ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৫.২. হাদীসের কথা, কাজ বা সমর্থনটির মূল উৎসের দিক দিয়ে/ সানাদের দিক থেকে হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

৫.২.১. **মারফূ' (مَرْفُـوْعٌ) হাদীস**ঃ যে হাদীসের সানাদের পরম্পরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তাকে মারফূ' হাদীস বলে। অন্যকথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থনই মারফূ' হাদীস।

৫.২.২. **মাওকূফ (مَوْقُـوْفٌ) হাদীস**: যে হাদীসের সানাদের পরম্পরা সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। অন্যকথায় সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনই মাওকূফ হাদীস।

৫.২.৩. **মাকতূ' (مَقْطُـوْعٌ) হাদীস**ঃ যে হাদীসের সানাদের পরম্পরা তাবি'ঈ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ' হাদীস বলে। অন্যকথায় তাবি'ঈগণের কথা ও কাজকে মাকতূ' হাদীস বলে।

৫.৩. সানাদের বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্যতার প্রেক্ষিতে/ রাবীদের সংখ্যা অনুযায়ী হাদীস দুই প্রকার। যথা-

৫.৩.১. **মুতাওয়াতির (مُتَـوَاتِرٌ) হাদীস**: আরবী মুতাওয়াতির (مُتَـوَاتِرٌ) শব্দটি 'তাওয়াতারা' (تَوَاتَرَ) থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ তাতাবু' تَتَـابُعٌ অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে আসা।[১১] যেমন বলা হয়- (تَتَابَعَ الْوَلَدُ أَبَـاهُ) 'ছেলেটি তার পিতার পিছে পিছে এসেছে'। আর পারিভাষিক অর্থে মুতাওয়াতির বলা হয় ঐ হাদীসকে, যে হাদীসের সানাদে সকল যুগেই এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী রয়েছেন যারা সকলেই কোন একটি মিথ্যার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন বলে ধারণাও করা যায় না। এই মুতাওয়াতির হাদীস আবার দুই প্রকার: **এক. 'মুতাওয়াতির লাফযী'** বা শব্দগত মুতাওয়াতির। অর্থাৎ যার শব্দ এবং অর্থ সবই সকল পর্যায়ের বর্ণনাকারীদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে এক ও অভিন্ন রয়েছে। **দুই. 'মুতাওয়াতির মা'নভী'** বা অর্থগত মুতাওয়াতির। অর্থাৎ যার শব্দে বিভিন্নতা থাকলেও তার অর্থ সকল পর্যায়েই ধারাবাহিকভাবে এক ও অভিন্ন রয়েছে।

৫.৩.২. **আহাদ (آحَادٌ) হাদীস**ঃ আরবী 'আহাদ' (آحَادٌ) শব্দটি 'আহাদ' (أَحَدٌ) এর বহুবচন। যার অর্থ 'ওয়াহিদ' (وَاحِدٌ) বা এক। অর্থাৎ যা একজন

---

১১. আল-মুনজিদ ফিল্-লুগাতি ওয়াল আ'লাম, পৃ- ৮৮৫।

www.pathagar.com

রাবী বা বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। পরিভাষায় আহাদ বলা হয় ঐ হাদীসকে, যার মধ্যে মুতাওয়াতির এর যাবতীয় শর্ত বিদ্যমান নেই। এই আহাদ হাদীসকে আবার **'মাশহূর'** (مَشْهُوْر) , **'আযীয'** (عَزِيْز) ও **'গারীব'** (غَرِيْب) এই তিন প্রকারে বিভক্ত করা হয়।

যে হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোন যুগেই তিন জনের কম ছিল না তাকে **মাশহূর** হাদীস বলে।

যে বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন যুগেই দুই এর কম ছিল না তাকে **'আযীয** হাদীস বলে।

যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন কোন যুগে এক জনে পৌঁছেছে তাকে **গারীব** হাদীস বলে।

৫.৪. সানাদের বিচ্ছিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতা অনুপাতে/ রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে হাদীস দুই প্রকার। যথা-

৫.৪.১. মুত্তাসিল (مُتَّصِـــل) **হাদীসঃ** মুত্তাসিল আরবী শব্দ। এটি ইত্তিসাল (اِتِّصَال) থেকে এসেছে। যার অর্থ মিলিত হওয়া, লেগে থাকা বা বাদ না পড়া। যেসব হাদীসের সানাদে কোন পর্যায়েই কোন রাবী বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলা হয়। অর্থাৎ যে হাদীসের সানাদে প্রত্যেক পর্যায়েই সকল রাবীর নাম যথাস্থানে উল্লেখ রয়েছে তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে। আর সানাদ থেকে এরূপ রাবী বাদ না পড়াকে 'ইত্তিসাল' বলা হয়।

৫.৪.২. মুনকাতি' (مُنْقَطِـــع) **হাদীসঃ** মুনকাতি' আরবী শব্দ। এটি ইনকিতা' (اِنْقِطَاع) থেকে এসেছে। যার শাব্দিক অর্থ পৃথক থাকা, বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বাদ পড়ে যাওয়া। যেসব হাদীসের সানাদের কোন না কোন পর্যায়ে রাবী বাদ পড়েছে বা উহ্য রয়েছে তাকে মুনকাতি' হাদীস বলে। আর সানাদ থেকে এরূপ রাবী বাদ পড়াকে বলা হয় 'ইনকিতা'। সানাদের মধ্যে ইনকিতা' এর বিভিন্ন ধরন অনুযায়ী আবার মুনকাতি' হাদীসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন- মুরসাল (مُرْسَل), মু'আল্লাক (مُعَلَّق), মু'দাল (مُعْضَل), মুদাল্লাস (مُـــدَلَّس) ও মুদতারাব (مُضْطَرَب) ইত্যাদি।

৫.৫. সানাদের বিশুদ্ধতা ও হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে/ রাবীর গুণ অনুযায়ী আবার হাদীস তিন প্রকার। যথা-

৫.৫.১. সাহীহ (صَحِيْح) **হাদীস।** যে হাদীসের সানাদে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় সে হাদীসকে সাহীহ হাদীস বলেঃ

www.pathagar.com

ক. সানাদের রাবীগণ পরস্পর সংযুক্ত হওয়া বা মাঝখানে কোন রাবী বাদ না পড়া

খ. রাবী ন্যায়নিষ্ঠ অর্থাৎ কার্যকলাপ ও আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হওয়া

গ. রাবীর স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়া

ঘ. সানাদটি শায বা বিরল না হওয়া এবং

ঙ. সানাদটি মু'আল্লাল বা ত্রুটিপূর্ণও না হওয়া।

৫.৫.২. হাসান (حَسَن) হাদীস। যে হাদীসের সানাদে উপরোক্ত সাহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্য সমূহ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। কিন্তু রাবীর স্মরণশক্তির মধ্যে ত্রুটি আছে, তাকে হাসান হাদীস বলে। কিন্তু এই হাদীসের সমর্থনে যদি একই পর্যায়ে অন্য হাদীস বর্তমান থাকে তবে তাকে সাহীহ লি-গাইরিহী বলে।

৫.৫.৩. যা'ঈফ (ضَعِيْف) হাদীস। যে হাদীসের সানাদে সাহীহ ও হাসান হাদীসের সবগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বা তার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ত্রুটি আছে তাকে যা'ঈফ হাদীস বলে।

৬. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনুপাতে রাবীগণকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

এক. 'মুকসিরীন' (مُكْثِرِيْن) : যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০০০ এর উপরে, তাঁদেরকে মুকসিরীন বলা হয়।

দুই. 'মুতাওয়াস্‌সিতীন' (مُتَوَسِّطِيْن) : যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০০০ এর নিচে; কিন্তু ৫০০ এর উপরে, তাঁদেরকে মুতাওয়াস্‌সিতীন বলা হয়।

তিন. 'মুকিল্লীন' (مُقِلِّيْن) : যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ এর নিচে; কিন্তু ৪০ এর উপরে, তাঁদেরকে মুকিল্লীন বলা হয়।

চার. 'আকাল্লীন' (أَقِلِّيْن) : যাঁরা ৪০ এর কম হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদেরকে আকাল্লীন বলা হয়।

৭. হাদীস শাস্ত্রের কতক পরিভাষা:

সানাদ (سَنَد): হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সানাদ বলে।

মাতান (مَتَن): হাদীসের মূল বক্তব্যকে মাতান বলে।

রাবী (رَاوِي): সানাদে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিকে রাবী বলে।

সুনান (سُنَن): যে হাদীস গ্রন্থকে ফিক্‌হ এর তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে তাকে সুনান বলে।

www.pathagar.com

মুসনাদ (مُسْنَد): যে হাদীস গ্রন্থকে বর্ণনাকারী সাহাবীর তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে তাকে মুসনাদ বলে।

সাহীহাইন (صَحِيْحَيْن): সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে সাহীহাইন বলা হয়।

মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত একই হাদীস সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে বর্ণনা করা হলে তাকে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি বলা হয়।

হাফিয (حَافِظ): সানাদ ও মাতানসহ এক লক্ষ হাদীস মুখস্তকারী ব্যক্তিকে হাফিয বলা হয়।

হুজ্জাত (حُجَّة): সানাদ ও মাতানসহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্তকারী ব্যক্তিকে হুজ্জাত বলা হয়।

হাকিম (حَاكِم) : সানাদ ও মাতানসহ প্রায় সমস্ত হাদীস মুখস্তকারীকে হাকিম বলা হয়।

রিওয়ায়াত (رِوَايَة): হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিকে রিওয়ায়াত বলে।

দিরায়াত (دِرَايَة): হাদীস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে দিরায়াত বলে।

রিজাল (رِجَال): হাদীস বর্ণনাকারীদের সমষ্টিকে রিজাল বলে।

জামি' (جَامِع): যে গ্রন্থে হাদীসসমূহকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং যার মধ্যে নিম্নোক্ত আটটি অধ্যায়ও রয়েছে তাকে জামি' বলে। যথা-
সিয়ার, তাফসীর, 'আকাইদ, ফিতান, আদাব, আশরাত, আহকাম ও মানাকিব।

আস্‌সুনানুল আরবা'আ (السُّنَنُ الْأَرْبَعَة): সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন নাসায়ী, সুনানুত তিরমিযী ও সুনানু ইবনি মাজাহ- এ চারটি গ্রন্থকে একসাথে আস্‌সুনানুল আরবা'আ বলা হয়।

আস্ সিহাহুস্ সিত্তাহ/ আলকুতুবুস্ সিত্তাহ (اَلصِّحَاحُ السِّتَّةُ – اَلْكُتُبُ السِّتَّة): হাদীসের ছয় খানা গ্রন্থ তথা- বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহকে একসঙ্গে আস্ সিহাহুস্ সিত্তাহ/ আলকুতুবুস্ সিত্তাহ বলা হয়। (কারো কারো মতে, ইবনি মাজাহ এর স্থলে মুয়াত্তা, আবার কারো কারো মতে, ইবনি মাজাহ এর স্থলে মুসনাদ আহমাদ এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত)।

সাহীহুল বুখারী এবং সাহীহ মুসলিম ছাড়াও কেবল সাহীহ হাদীসেরই আরো সংকলন রয়েছে। যথা- সাহীহ ইবন হিব্বান, সাহীহ ইবন খুযাইমাহ ও মুসতাদরাক হাকিম।

আলআসার (اَلْأَثَر): সাহাবায়ে কিরামের কথা ও কাজকে আসার বলে।

আশ্‌শাইখ (اَلشَّيْخ): হাদীসের শিক্ষককে শাইখ বলে।

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস (مُحَـدِّث): সানাদ ও মাতানসহ হাদীসের চর্চা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস বলে।

রিসালাহ (رِسَـالَة): মাত্র একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই যে হাদীস গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে রিসালাহ বলে। যেমন ইবন খুযাইমাহ রচিত তাওহীদ বিষয়ক গ্রন্থ।

ফাকীহ (فَقِيْـه): যাঁরা হাদীসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাঁদেরকে ফাকীহ বলে।

৮. সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস তথা সুন্নাহকে সাহাবায়ে কিরামই তাদের স্মৃতিপটে ও কর্মের মাঝে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁরা তাঁর থেকে যা শুনেছেন, যা তাঁকে করতে দেখেছেন এবং তাঁদের যেসব কর্ম রাসূল কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে সেগুলো নিজেরা চর্চা করতেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আমানাতদারীর সাথে তাঁরা তা পরস্পরের মাঝে বিনিময় করতেন। নিজে ঠিক যা শুনেছেন বা যা দেখেছেন তাই তিনি অপরকে বলতেন। এ কারণেই কোন কোন কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত একাধিক পদ্ধতি এবং কোন কোন বর্ণনার শব্দগত ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। রাসূলের মৃত্যুর পর সুন্নাহর এরূপ চর্চা আরো বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সব সাহাবী রাসূলকে সর্বাবস্থায় কাছে থেকে দেখার বা শুনার সুযোগ পাননি। তাই তাঁরা রাসূলের মৃত্যুর পর নিজেদের মাঝে এগুলো নিয়ে চর্চা করতেন। পরস্পরের মাঝে রাসূলের হাদীস নিয়ে তাঁদের এই চর্চাই পরবর্তীকালে হাদীস সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে পড়েন তাঁরা হাদীস চর্চায় খুব বেশি মনোনিবেশ করতে পারেননি। এ কারণেই আমরা খুলাফায়ি রাশিদীনকে এক্ষেত্রে কম অগ্রণী দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্য তথা আত্মীয়গণ, বাল্যকাল থেকে যেসব সাহাবী রাসূলের খাদিম হিসেবে তাঁর কাছাকাছি থাকতেন এবং যাঁরা আহলুস্ সুফ্ফার সদস্য ছিলেন তাঁদেরকেই আমরা এক্ষেত্রে অগ্রণী দেখতে পাই। হাদীস বর্ণনায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী এসব সাহাবীকে 'আলমুকসিরূনা মিনাস্ সাহাবাহ' (الْمُكْثِرُوْنَ مِنَ الصَّحَابَة) সাহাবাদের মধ্যে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী বলা হয়। পরবর্তীকালে হাদীসের গ্রন্থসমূহ সংকলনের সময় এসব অধিক বর্ণনাকারী

www.pathagar.com

সাহাবীর নাম উঠে আসে হাদীসের যে বিশাল ভান্ডার আজ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত দেখা যায় তার সাথে কম বেশি প্রায় দশ হাজার সম্মানিত সাহাবীর নাম জড়িত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক বর্ণনাকারী হিসেবে যাঁদের নাম উঠে আসে তাঁরা হলেন:

ক্রমিক	সাহাবীর নাম	মৃত্যু সাল	বয়স	বর্ণিত হাদীস সংখ্যা
১	আবূ হুরাইরাহ (রা.)	৫৭ হিজরী	৭৮	৫৩৭৪
২	'আয়িশাহ সিদ্দীকাহ (রা.)	৫৮ হিজরী	৬৭	২২১০
৩	'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)	৬৮ হিজরী	৭১	১৬৬০
৪	'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)	৭৪ হিজরী	৮৪	১৬৩০/২৬৩০
৫	জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রা.)	৭৮ হিজরী	৯৪	১৫৪০
৬	আনাস ইবনু মালিক (রা.)	৯৩ হিজরী	১০৩	১২৮৬/২২৮৬
৭	আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.)	৭৪ হিজরী	৮৬	১১৭০
৮	'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)	৩২ হিজরী	৮৪	৮৪৮
৯	'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)	৬৫ হিজরী	৭২	৭০০

একশ'র বেশি এবং সাতশ'র কম হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবীও অনেক আছেন। আর এক থেকে একশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবীর সংখ্যা হলো হাজার হাজার।

৯. হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণ:

সম্মানিত সাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছেন হাজার হাজার তাবি'ঈ। একমাত্র আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে যেসব তাবি'ঈ হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছেন তাদের সংখ্যাই প্রায় আটশ'। এভাবে প্রত্যেক সাহাবী থেকেই বহুসংখ্যক তাবি'ঈ হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ এমন রয়েছেন যাঁরা হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সংকলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা হলেন:

১. সা'ঈদ ইবনুল মূসাইয়্যিব (রহ.)
২. 'উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহ.)
৩. হাসান আল বাসরী (রহ.)
৪. ইবনু সীরীন (রহ.)

www.pathagar.com

৫. সালিম ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রহ.)
৬. নাফি' মাওলা 'আব্দিল্লাহ ইবনি 'উমার (রহ.)
৭. 'আলী ইবনু হুসাইন (রহ.)
৮. মুজাহিদ (রহ.)
৯. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আবী বাকর (রহ.)
১০. শুরাইহ (রহ.)
১১. মাসরূক (রহ.)
১২. আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রহ.)
১৩. মাকহূল (রহ.)
১৪. হাম্মান ইবনু মুনাব্বিহ (রহ.)
১৫. সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রহ.)
১৬. সুলাইমান আল আ'মাশ (রহ.)
১৭. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদার (রহ.)
১৮. ইবনু শিহাব আয্ যুহরী (রহ.)
১৯. সুলাইমান ইবনুল ইয়াসার (রহ.)
২০. ইকরামা মাওলা ইবনি 'আব্বাস (রহ.)
২১. 'আতা ইবনু আবী রাবাহ (রহ.)
২২. কাতাদাহ (রহ.)
২৩. 'আমির আশ্ শা'বী (রহ.)
২৪. 'আলকামাহ (রহ.)
২৫. ইবরাহীম আন্ নাখ'ঈ (রহ.) ও
২৬. ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব (রহ.) প্রমুখ।

উপরোল্লিখিত তাবি'ঈগণের প্রায় সকলেই দশম হিজরীর পরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। সাহাবীগণও প্রায় সকলেই ১০০ হিজরীর মধ্যে মারা যান। অতএব এ সকল তাবি'ঈ সাহাবাগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। সাহাবীগণের ঘরেই তাঁদের অধিকাংশের জন্ম এবং তাঁদের কোলেই তাঁরা লালিত পালিত হন। অর্থাৎ জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁরা কোন না কোন সাহাবীর সংস্পর্শেই কাটিয়েছেন। তাঁরা এক একজন বহুসংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর মুখনিসৃত বাণী, তাঁর কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন ও পরবর্তীদের নিকট তা পৌঁছান।

www.pathagar.com

এরপর আসে হাজার হাজার কনিষ্ঠ তাবি'ঈ ও তাবি' তাবি'ঈদের কথা। যাঁরা মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিলেন। তাবি'ঈদের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে তাঁরা তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন।

১০. হাদীস সংকলনের ইতিকথা:

তিনটি নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসগুলো আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর তা হলো-

এক. হাদীসের ভিত্তিতে গোটা মুসলিম উম্মাহর বাস্তব আমল পরিচালনা।

দুই. হাদীসকে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য তা মুখস্তকরণ।

তিন. লেখনীর মাধ্যমে হাদীসকে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ।

মূলত: হাদীসের বিশাল ভান্ডার সংরক্ষিত হয়েছিল উহার পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে। সে হিসেবে হাদীস সংগ্রহ, বিন্যাস ও পুস্তকাকারে সংকলন তৈরি করার গোটা সময়টাকে প্রধানত: চারটি যুগে ভাগ করা যায়। যথা-

১০.১. প্রথম যুগ:

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে হিজরী প্রথম শতকের শেষ পর্যন্ত। এ যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে প্রধানত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান সাহাবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে কারো কারো সহস্রাধিক হাদীস মুখস্ত ছিল। সাহাবীগণ ছাড়া এ যুগের একদল মহান তাবি'ঈর কথাও এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। যাদের নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় হাদীসের বিশাল ভান্ডার থেকে মুসলিম মিল্লাত কিয়ামাত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- সা'ঈদ ইবনুল মূসাইয়্যিব, 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর, সালিম ইবনু 'আব্দুল্লাহ, নাফি' (রহ.) প্রমূখগণ।

এ যুগের প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তাবি'ঈগণ নিজ নিজ নামে হাদীসের সংকলন করেন। যার কোন কোনটি পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। আবার কোন কোনটি একাধিক খন্ডেও প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমরের (রা.) 'সাহীফায়ি সাদিকাহ', হুম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (রহ.) এর 'সাহীফায়ি সাহীহাহ' ও 'মুসনাদি আবূ হুরাইরাহ' সমধিক প্রসিদ্ধ।

১০.২. দ্বিতীয় যুগ:

এই যুগটি দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এটিই মূলত: হাদীস সংকলনের প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ। এই যুগে তাবি'ঈদের একটি বিরাট দল তৈরি

www.pathagar.com

হয়ে যায়। যারা প্রথম যুগের লিখিত ভান্ডারকে ব্যাপক সংকলন সমূহে একত্র করেন।

এই যুগে হাদীস সংকলনের কাজে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব আয্যুহরী (রহ.) ও ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহ.) প্রমুখ তাবি'ঈগণ।

১০.৩. তৃতীয় যুগঃ

এই যুগ দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষের দিক থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে হাদীস শাস্ত্র বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। যেমন- রিজাল শাস্ত্র, উসূলি হাদীস শাস্ত্র, তাখরীজুল আহাদীস শাস্ত্র ও ফিক্হুল হাদীস শাস্ত্র ইত্যাদি। এই যুগের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ:

১. নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস সমূহকে সাহাবীগণের আসার ও তাবি'ঈদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলিত করা হয়।

২. এ যুগে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের পৃথক সংকলন প্রস্তুত করা হয়। এভাবে যাচাই-বাছাই এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগে এসে বিরাট গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।

৩. এই যুগে হাদীসসমূহ কেবল একত্রই করা হয়নি, 'ইলমি হাদীসের হিফাযাতের জন্য মহান মুহাদ্দিসগণ 'ইলমের এক শতাধিক শাখার ভিত্তি স্থাপন করেন। যার উপর ভিত্তি করে বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

১০.৩.১. এই যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলকবৃন্দ ও তাদের নির্ভরযোগ্য সংকলনগুলো হলোঃ

১. ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহ.) (৯৩-১৭৯ হি.)-এর সংকলন- মুয়াত্তা।

২. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহ.) (১৬৪-২৪১ হি.)-এর সংকলন- মুসনাদ।

৩. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আলবুখারী (রহ.) (১৯৪-২৫৬ হি.)-এর সংকলন- সাহীহুল বুখারী।

৪. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আলকোশাইরী (রহ.) (২০৪-২৬১ হি.)-এর সংকলন- সাহীহ মুসলিম।

৫. ইমাম আবূ দাউদ আশ'আস ইবনু সুলাইমান আস্ সিজিস্তানী (রহ.) (২০২-২৭৫ হি.)-এর সংকলন- সুনানু আবী দাউদ।

www.pathagar.com

৬. ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আত্ তিরমিযী (রহ.) (২০৯-২৭৯ হি.)-এর সংকলন- জামি' আত্-তিরমিযী।
৭. ইমাম আহমাদ ইবনু শু'আইব আন্ নাসাঈ (রহ.) (২১৪-৩০৩ হি.)-এর সংকলন- আস্সুনানুল মুজতাবা।
৮. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ আলকাযবীনী (রহ.) (২০৭-২৭৫ হি.)-এর সংকলন- সুনানু ইবনি মাজাহ।

ইমাম আহমাদের মুসনাদ এবং ইমাম মালিকের মুয়াত্তা ছাড়া উল্লেখিত বাকী ছয়টি গ্রন্থকে কোন কোন হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় 'আস্সিহাহ আস্সিত্তাহ' (الصِّحَاحُ السِّتَّةُ) বা ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ নামে আখ্যায়িত করা হয়। আবার কেউ কেউ এগুলোকে 'আলকুতুব আস্সিত্তাহ' (الكُتُبُ السِّتَّةُ)ও বলে থাকেন। কেননা এগুলোর ভিতর এমন গ্রন্থও রয়েছে যাকে এর সংকলক নিজেও সাহীহ নামে আখ্যায়িত করেননি। তাছাড়া এগুলোর সকল হাদীস সাহীহ বলে প্রমাণিতও নয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ 'আলিম ইবনু মাজাহ এর পরিবর্তে ইমাম মালিকের মুয়াত্তাকে ছয়টি গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করেন। আর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের গ্রন্থ দু'টোকে একসংগে সর্বসম্মতভাবে 'আস্সাহীহাইন' (الصَّحِيْحَيْن) বা দু'টো বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করা হয়। উল্লেখিত গ্রন্থগুলো ছাড়া এ যুগে আরও অনেক প্রয়োজনীয় এবং পূর্ণাংগ গ্রন্থ রচিত হয়।

১০.৪. চতুর্থ যুগঃ

এই যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই যুগের কাজগুলো ছিল প্রধানতঃ নিম্নরূপ-

১. হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর ভাষাগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।
২. হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে সেসব বিষয়ের উপর এই যুগেই অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেই সাথে এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপও রচিত হয়েছে।
৩. বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ নিজেদের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস চয়ন করে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। এ ধরনের গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

www.pathagar.com

'রিয়াদুস্ সালিহীন', 'মুনতাকাল আখবার', 'বুলুগুল মুরাম' ও 'মিশকাতুল মাসাবীহ' ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একটি যুগেও হাদীসের চর্চা বন্ধ হয়নি। দিনরাত সবসময় এর চর্চা অব্যাহত ছিল, আছে এবং থাকবে।

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে হাদীস সংকলনঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাঁর হাদীসসমূহ প্রধানতঃ সাহাবীদের মুখে মুখেই সংরক্ষিত ছিল। অবশ্য সে সময়েও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু হাদীস লিখে রাখা হয়। এমনকি পরবর্তীকালে সেসব লিখার কোন কোনটি পুস্তিকার রূপ নেয় বলেও জানা যায়। যেমন ইমাম আবূ দাউদ থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে-

إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُهُ مِنْكَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنِّيْ لاَ أَقُوْلُ إِلاَّ حَقًّا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অবস্থা এবং রাগান্বিত অবস্থায় যা যা শুনেন তা সবই লিখে রাখতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে অনুমতি দিয়ে বললেন যে, তুমি লিখতে পার। কারণ আমি তো কখনোই অসত্য কিছু বলি না।[১২]

'আব্দুল্লাহ (রা.) এবার অনুমতি পেয়ে হাদীস লিখতে শুরু করেন এবং এ লিখাগুলোকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে এর নাম দেন (اَلصَّحِيْفَةُ الصَّادِقَةُ) 'আস্সাহীফাহ আস্সাদিকাহ'। এতে তিনি মোট একহাজার হাদীস একত্রিত করেন। এ ব্যাপারে আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর একটি উদ্ধৃতিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) এর নিকট আমার চেয়েও বেশি হাদীস ছিল। কারণ তিনি হাদীস লিখতেন এবং মুখস্তও রাখতেন। আর আমি শুধু মুখস্তই রাখতাম।

এতদোভয় বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে সময়েও হাদীস লিখে রাখা হত। অবশ্য কিছু কিছু বর্ণনা দ্বারা সেসময় হাদীস লিখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞাও প্রমাণিত হয়। যেমনঃ

---

১২. সুনান আবী দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৩১৮, হাদীস নং- ৩৬৪৬

www.pathagar.com

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غير الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي ولا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قال هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قال مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النَّارِ .

আবূ সা'ঈদ আলখুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা আমার থেকে লিখো না। কোরআন ছাড়া অন্য কিছু যদি কেউ লিখে থাক, তাহলে তা মুছে ফেল। তবে আমার থেকে তোমরা হাদীস বর্ণনা কর, তাতে সংকোচের কিছু নেই। অবশ্য কেউ যদি আমার ব্যাপারে মিথ্যারোপ করে (রাবী হাম্মাম বলেন: আমার মনে হয় তিনি এখানে (مُتَعَمِّدًا) 'মুতা'আম্মিদান'/ ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দটি উল্লেখ করেছেন) তাহলে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান ঠিক করে নিল।[১৩]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর থেকে হাদীস লিখা এবং বর্ণনা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন।

১২. উপরোক্ত দ্বৈত বর্ণনার সমাধান:

'আল্লামা তাহাবী (রহ.) তাঁর 'শারহু মা'আনী আলআসার' গ্রন্থে এই দ্বিবিধ বর্ণনার নিম্নরূপ সমাধান দিয়েছেন:

এক. এই নিষেধাজ্ঞা ছিল কোরআন নাযিলের প্রাথমিক সময়ে। কারণ তখন কোরআনের সাথে কোরআনের বাইরের বস্তু মিশে যাওয়ার ভয় ছিল। তবে প্রাথমিক সময় পার হয়ে যাওয়ার পর অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়।

দুই. অনুমতি ছিল ঐসব সাহাবীদের জন্য যাদের স্মরণ শক্তি দূর্বল ছিল। আর নিষেধাজ্ঞা ছিল তাদের জন্য যাদের স্মরণশক্তি দূর্বল নয়।

তিন. এই নিষেধাজ্ঞা ছিল একই স্থানে কোরআন এবং হাদীসকে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে। আর অনুমতি ছিল আলাদা আলাদা লিখার ব্যাপারে।

চার. নিষেধাজ্ঞা ছিল ঐসব সাহাবীর স্মরণশক্তির দূর্বলতার কারণে। তারা হয়ত পরে ভুলে যাবেন যে, এটি কোরআন ছিল না হাদীস।

পাঁচ. যেহেতু ঋণকে ভুলে যাওয়া এবং এতে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে আল্লাহ পাক তা লিখে রাখার আদেশ করেছেন, সেহেতু দীনের এই 'ইলম তো আরো অধিক লিখে রাখার যোগ্য। যাতে এর মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি হতে না পারে।

---

১৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২২৯৮, হাদীস নং- ৩০০৪

www.pathagar.com

১৩. হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা:

ইসলাম যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রে সম্প্রসারিত হল এবং আরো অনেক নতুন নতুন এলাকা যখন বিজিত হতে থাকল এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও চাকরী-বাকরীতে মানুষের ব্যস্ততা বাড়তে আরম্ভ করল, তখন জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ল। এমনিভাবে তাবি'ঈদের যুগের শেষ দিকে এসে দেখা গেল যে, একদিকে দিন দিন বিশিষ্ট প্রবীন সাহাবীদের ইন্তিকাল হচ্ছে অপরদিকে তাঁদের সাথী এবং অনুগতরাও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আবার সেই সাথে মানুষের স্মৃতি শক্তি ও সংরক্ষণ ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেখে যাওয়া হাদীসগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা শুরু করতে লাগলেন। আর এ কারণেই তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবগুলো হাদীসকে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৪. কে, কখন প্রথম এ উদ্যোগ নেন?

সর্বপ্রথম যে মহান ব্যক্তি এ মহতি উদ্যোগ নেন তিনি হলেন খোলাফায়ে রাশিদার পঞ্চম খালীফাহ বলে খ্যাত বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'উমার ইবনু 'আব্দিল 'আযীয (রহ.)। এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল 'ইলম এর মধ্যে বলেন-

إِنَّ عُمَرُ بن عبد الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بن حَزْمٍ: انْظُرْ ما كان من حديث رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاكْتُبْهُ فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

'উমার ইবনু 'আব্দিল 'আযীয (রহ.) (তাঁর মাদীনাস্থ প্রতিনিধি) আবূ বাকর ইবনু হাযমকে (রহ.) এই মর্মে লিখেন যে, অনতিবিলম্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসসমূহের সংকলন ও পূর্ণ সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কর। কেননা আমি 'আলিমদের মৃত্যুর সাথে সাথে 'ইলমের বিলুপ্তির আশংকা করছি।[১৪]

এ ব্যাপারে শাসক গোষ্ঠির মধ্যে মূলত: 'উমার ইবনু 'আব্দিল 'আযীযই (রহ.) সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজে গভীরভাবে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। অত:পর নিজ তত্ত্বাবধানে সমকালীন 'আলিমদেরকে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানান। তারা সকলেই তখন তাঁর এই আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন।

---

১৪. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪৯, হাদীস নং- ৯৯

www.pathagar.com

আর এরই ফলশ্রুতিতে আজকের এ বিশাল হাদীস সম্পদ আমাদের সামনে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হিসেবে বিদ্যমান। এই মহতী উদ্যোগের মাধ্যমে হাদীসের বিশাল ভান্ডার বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং তা যথার্থরূপে সংরক্ষিত হতে থাকে।

১৫. হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় প্রথম যাঁরা অবদান রাখেন:

১. ইবনু জুরাইজ (রহ.) মাক্কায়,
২. ইবনু ইসহাক (রহ.) এবং ইমাম মালিক (রহ.) মাদীনায়,
৩. ইবনু সুবাই' (রহ.) বাসরায়,
৪. সুফইয়ান সাওরী (রহ.) কূফায়,
৫. আউযা'ঈ (রহ.) শামে,
৬. হুশাইম (রহ.) ওয়াসিতে,
৭. মা'মার (রহ.) ইয়ামানে এবং
৮. 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহ.) খুরাসানে।

উল্লেখ্য যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন একই সময়ের। এছাড়া খালীফার নির্দেশের সংগে সংগে যারা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মেহনত করতেন তাদের কয়েকজন হচ্ছেন:

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব আয-যুহরী (রহ.), আবূ বাকর ইবনু হাযম (রহ.) ও সালিম ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রহ.) প্রমূখ তাবি'ঈগণ। তবে তাঁদের মধ্যে কার সংকলন সর্বপ্রথম হয় তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম যুহরীর (রহ.) সংকলন হয় সর্বপ্রথম। আবার কারো কারো মতে ইবনু সুবাই' (রহ.) এর সংকলনটি ছিল সর্বপ্রথম।

---

www.pathagar.com

দারসুল হাদীস

হাদীস নং- ১

নিয়্যাতের গুরুত্ব

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

'আলকামাহ ইবন ওয়াক্কাস আল্‌লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়্যাতের উপরই নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই প্রাপ্ত হয় যা সে নিয়্যাত করেছে। কাজেই কারো হিজরাত যদি হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিই পাবে। আর কারো হিজরাত যদি হয় দুনিয়ার কোন সুখ-সুবিধা প্রাপ্তির জন্য অথবা কোন নারীকে বিবাহের জন্য তাহলে তার সে উদ্দেশ্যই অর্জন হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরাত করলো।[১৫]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী হলেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)। তাঁর মূল নাম 'উমার। উপনাম আবূ হাফস। উপাধি আলফারূক। পিতার নাম খাত্তাব। মাতার নাম হানতামাহ বিনতি হাশিম ইবনি মুগীরাহ। ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। রাসূলের চেয়ে তিনি ১৩ বছরের ছোট ছিলেন। হিজরাতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বৎসর।

---

১৫. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃষ্ঠা-৩, হাদীস নং-১

www.pathagar.com

বাল্যজীবনে 'উমার ইবনুল খাত্তাব পিতা-মাতার আদরে লালিত পালিত হন। একটু বড় হয়েই তিনি পিতাকে উট চরাতে সাহায্য করেন। যৌবনের প্রারম্ভে যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তিবিদ্যা, বক্তৃতা এবং নসবনামা শিক্ষা লাভ করে তিনি অত্যন্ত আত্ম-প্রত্যয়ী যুবক হিসেবে বেড়ে ওঠেন। নাবুওয়াতের ষষ্ঠ সালে স্বেচ্ছায় বীরদর্পে রাসূলের কাছে গিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ হয়। অত:পর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আলফারূক উপাধিতে ভূষিত করেন। কেননা তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে হাক্ক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়।

প্রথম খালীফাহ আবূ বাকর আস্‌সিদ্দীক (রা.) এর ইন্তিকালের পর হিজরী ১৩ সালের জুমাদাল আখিরাহ মাসে তিনি খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সাড়ে দশ বছর খিলাফাতের দায়িত্ব পালনের পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাসনামলে প্রায় সহস্রাধিক রাজ্য বিজিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী সাল গণনা চালু করেন। সামরিক কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠা, কাজীর পদ সৃষ্টি ও বিধর্মীদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনিই বাস্তব ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

যে দশজন সাহাবী দুনিয়ায় থেকেই জান্নাতের সুসংবাদ পান তিনি তাঁদের একজন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি একনিষ্ঠভাবে রাসূলের সাহচর্যে থাকেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয় এবং মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। পরবর্তীতে নিজের মেয়ে হাফসাহকে (রা.) রাসূলের সাথে বিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তিনি রাসূলের শ্বশুর এবং উম্মুল মু'মিনীনের পিতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। একবার 'উমার (রা.) এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে 'উমার (রা.) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে (আমার নিজেকে ছাড়া) দুনিয়ার সকলের চেয়ে অধিক ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর কসম! হে 'উমার, তুমি এখনো মু'মিন হতে পারনি। বিনীত কণ্ঠে 'উমার (রা.) শুধালেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তাহলে কী করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানালেন: তোমাকে তোমার নিজের চেয়েও আমাকে অধিক ভালোবাসতে হবে। 'উমার (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এখন থেকে আপনি আমার

www.pathagar.com

কাছে আমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: (الآنَ يَا عُمَرُ) 'হে 'উমার! এতক্ষণে তুমি মু'মিন হলে'।[১৬] প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় তিনি হাদীস বর্ণনায় অনেক বেশি অবদান রাখতে পারেননি। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৯ টি। সাহীহুল বুখারীতে এককভাবে ৯ টি এবং সাহীহ মুসলিমে এককভাবে ১৫ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি অনেক হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাজ্যের বিভিন্ন শাসকদের নিকট প্রেরণ করেন। জনসাধারণকে হাদীস শিক্ষা দানের জন্য তিনি বড় বড় সাহাবীদেরকে বিভিন্ন রাজ্যে পাঠান। সেখানে তাঁরা হাদীসের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাদীস শাস্ত্রের বড় বড় মুহাদ্দিস তৈরি করেন। হাদীস রিওয়ায়াতের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের জন্য তিনি মজবুত নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর আশংকা হচ্ছিল যে, হাদীস শাস্ত্র গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে গেলে মুহাদ্দিসগণ কোরআনের তুলনায় হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বসতে পারে।

হিজরী ২৩ সালের ২৪শে যিলহাজ্জ বুধবার মাসজিদে নাবাবীতে নামাযের ইমামত করার সময় মুগীরা ইবনু শু'বার কৃতদাস আবূ লু'লু' তাঁকে বিষাক্ত তরবারী দিয়ে আঘাত করলে তিনি মারাত্মকরূপে আহত হন। তিন দিন পর ২৭শে যিলহাজ্জ শনিবার তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে নিয়্যাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষ যে নিয়্যাতে কোন কাজ করে সে আলোকেই সে কাজের ফল পায়। যে কোন কাজের মাধ্যমে বৈষয়িক কোন স্বার্থ চিন্তা করলে তাই অর্জিত হয়। আর আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি চাইলে তাই অর্জিত হয়। লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম চাওয়াও অন্যায় এবং পাওয়াও অসম্ভব। বিশেষ করে মৌলিক 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যে কোনরূপ ব্যত্যয় ইসলামে অনুমোদিত নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .

"আর তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে, তারা যেন একনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহর দীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করে"।[১৭] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

---

১৬. সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩৪৯১

১৭. আলকোরআনঃ সূরা আল বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫

www.pathagar.com

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً .

"তবে তাদের মধ্যে যারা তাওবাহ করবে, নিজেদের কার্যাবলী সংশোধন করে নিবে, আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেদের দীনকে খালিস করে নিবে তারা ঐসব লোক যারা মু'মিনদের সাথেই রয়েছে। আল্লাহ মু'মিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরষ্কার দিবেন"।[১৮]

তাই মু'মিনের সকল কাজ হবে একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহরই জন্যে নিবেদিত। অন্যথায় তা শুদ্ধও হবে না এবং মহান আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্যও হবে না। নিয়্যাত সংক্রান্ত আলোচ্য হাদীসটির বক্তব্যও তাই। এটি ইসলামী জীবন বিধানের মূল ফর্মুলা হিসেবে গণ্য। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর সাহীহুল বুখারীতে এই হাদীসটিকেই প্রথমে স্থান দিয়েছেন। নিয়্যাতের এহেন গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই অনেক লেখক তাদের লিখনীতে এটিকে প্রথমে স্থান দেন। কারো কারো মতে, এই হাদীসটি ইসলামের এক তৃতীয়াংশ। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এই হাদীসটি দিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করতেন।

ইসলামে নিয়্যাতের গুরুত্ব এ কারণেও বেশি যে, মানুষ যখন কোন ভাল কাজের নিয়্যাত করে তখনই তাকে এর জন্য একটি সাওয়াব দেয়া হয়। আর যখন সে কাজটি বাস্তবে করে তখন তাকে তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে সে যখন কোন মন্দ কাজের নিয়্যাত করে তখন তার আমলনামায় কোন গুনাহ লিখা হয় না। অথচ সে যখন সেই মন্দ কাজটি বাস্তবে করে তখন তার বিরুদ্ধে কেবল একটি গুনাহই লিখা হয়। আবার মন্দ কাজ সে যত ভাল নিয়্যাতেই করুক না কেন তার জন্য তা বৈধও নয় এবং সে এর কোন প্রতিদানও আশা করতে পারে না। এ সকল কারণেই মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। কথাটিতে অল্প শব্দে অধিক অর্থ নিহিত রয়েছে। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি ছিলেন (جَوَامِعُ الْكَلِم) 'জাওয়ামি'উল কালিম'। অর্থাৎ তিনি এমন শব্দ চয়নে কথা বলতেন যাতে অনেক অর্থের সমাহার থাকতো। যে কোন

---

১৮. আলকোরআনঃ সূরা আন্ নিসা, ৪:১৪৬

www.pathagar.com

কাজ বিশুদ্ধ হতে হলে তার নিয়্যাত তথা উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ হতে হবে। একইভাবে যে কোন কাজ থেকে যথাযথ ফলাফল পেতে হলেও নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা লাগবে। নিয়্যাত সঠিক না হলে কাজ সঠিক হতে পারে না। আবার নিয়্যাত সঠিক না হলে কাজের ফলাফলও সঠিক হবে না।

হাদীসটির শুরুতে এই নীতিকথাটি বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই একে আরো পরিষ্কার করার জন্য ব্যাখ্যা হিসেবে বললেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই বরাদ্দ থাকে যা সে নিয়্যাত করে। এখানে 'ইমরুউন' শব্দটিকে নাকিরাহ / অনির্দিষ্টবাচক ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'লি কুল্লি' শব্দটিকে তার সাথে জোড়ে দিয়ে এটিকে আরো ব্যাপক অর্থবোধক করা হয়েছে। ফলে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, ধনী-গরীব, 'আলিম-জাহিল, ছাত্র-শিক্ষক, চাকুরীজীবী-ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণি পেশার লোককেই এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এরপর তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বললেন: কাজেই কেউ যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হিজরাত করে তাহলে তার হিজরাত দ্বারা এ লক্ষ্যই অর্জিত হবে। আর যদি কারো হিজরাত দুনিয়াবী কোন স্বার্থসিদ্ধি অথবা বিশেষ কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তার হিজরাত দ্বারা সে উদ্দেশ্যই অর্জিত হবে। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'দুনইয়া' এবং 'ইমরাআহ' শব্দ দু'টিকে নাকিরাহ / অনির্দিষ্টবাচক ব্যবহার করেছেন। ফলে এটিও ব্যাপকতা বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ দুনিয়ার যে কোন স্বার্থসিদ্ধি অথবা যে কোন নারীকে বিয়ের লক্ষ্যে হিজরাত করে থাকলে কেবল তাই অর্জিত হবে; আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না।

আবার নিয়্যাত শব্দটিকেও তিনি বহুবচনে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নিয়্যাতের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তাছাড়া একই কাজের মাধ্যমে কারো ভাল নিয়্যাত এবং কারো খারাপ নিয়্যাত থাকতে পারে। অথবা একই কাজের একাধিক নিয়্যাতও থাকতে পারে। অথবা একই কাজ করে একজন সঠিক নিয়্যাতের কারণে সুফল পাবে; আর অপরজন বেঠিক নিয়্যাতের কারণে সুফল থেকে বঞ্চিত হবে .. ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন:

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: মহান আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক অবয়ব এবং ধন-

www.pathagar.com

সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর এবং বাস্তব কর্মের দিকে তাকান।[১৯]

হিজরাতের প্রসঙ্গ দিয়ে উদাহরণ দেয়ার কারণঃ

হিজরাত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ত্যাগ করা, সম্পর্কচ্ছেদ করা, ছেড়ে দেয়া, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাওয়া ইত্যাদি। মহান আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করাও শাব্দিক অর্থে হিজরাত। আর শারী'আতের পরিভাষায় হিজরাত হলো- নিজের দীন ও ঈমান রক্ষার নিমিত্তে 'দারুল হারব' থেকে 'দারুল ইসলামে' প্রস্থান করা। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং নিজেদের দীন ও ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যে মাক্কাহ (দারুল হারব) ছেড়ে আলমাদীনায় (দারুল ইসলাম) হিজরাত করেছিলেন।

হিজরাত ইসলামের একটি মৌলিক 'ইবাদাত। এ 'ইবাদাতটি করতে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়। আর তাই এর ফযীলতও অনেক বেশি। হিজরাতের গুরুত্ব ও মুহাজিরদের মর্যাদা বর্ণনায় আলকোরআনে অনেক আয়াত এসেছে। এই হিজরাতের বিধান রহিত হয়ে যায়নি। নিজের দীন ও ঈমান রক্ষার খাতিরে এটি এখনো চলমান আছে এবং চলমান থাকবে। হাদীসে এসেছে-

عن مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا .

মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তাওবাহ করার অবকাশ থাকা পর্যন্ত হিজরাতের ধারা বন্ধ হবে না। আর তাওবার অবকাশও বন্ধ হবে না পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত।[২০]

ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক 'ইবাদাতটি সম্পাদন করতে গেলে নিয়্যাতের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরী। অন্যথায় এত ত্যাগ বিফলে যাওয়াকে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। অতএব অন্যান্য 'ইবাদাতের বেলায়ও নিয়্যাত যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা স্পষ্ট করার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরাতের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

---

১৯. সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৯৮৭, হাদীস নং- ২৫৬৪

২০. সুনান আবী দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৩, হাদীস নং- ২৪৭৯

www.pathagar.com

তাছাড়া যে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন তখন হিজরাতের মৌসুম চলছিল। সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের দীন ও ঈমান রক্ষার্থে আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেদের বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পত্তি এবং আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। ঐ সময় তাদের এই ত্যাগ নিয়্যাতের শুদ্ধতার অভাবে যেন বিফলে না যায় সে জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়্যাতের গুরুত্ব বলতে গিয়ে বিশেষভাবে হিজরাতের উদাহরণ দিয়ে থাকতে পারেন।

দুনিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরাত অথবা কোন নারীকে বিয়ের উদ্দেশ্যে হিজরাত প্রসঙ্গঃ
হিজরাতের উদ্দেশ্য যদি হয় বৈষয়িক কোন স্বার্থ হাসিল করা কিংবা বিশেষ কোন নারীকে বিবাহ করা তাহলে এই হিজরাত দিয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে না। বরং ঐ উদ্দেশ্যই অর্জিত হবে যার জন্য সে হিজরাত করেছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন এমন যিনি একজন মুসলিম নারীকে ভালবাসতেন। ঐ নারী যখন তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে হিজরাত করে ফেলেছে, তখন তার প্রেমিক পুরুষ সাহাবীও তাকে পাওয়ার আশায় হিজরাত করতে মনস্থ করে। বিষয়টি অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেহেতু কোন নারীকে বিবাহ করা এটিও দুনিয়াবী স্বার্থেরই একটি, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে সাধারণভাবে দুনিয়ার যে কোন স্বার্থের কথা বলার পর পরবর্তীতে বিশেষভাবে কোন নারীকে বিয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।
উল্লেখ্য যে, হাদীসে উল্লেখিত ঐ নারীর নাম ছিল কায়েলা, উপনাম উম্মি কাইস। পুরুষ সাহাবীটির নাম জানা যায়নি। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাকে 'মুহাজিরে উম্মি কাইস' / উম্মি কাইসের উদ্দেশ্যে হিজরাতকারী নামে অভিহিত করা হয়।

নিয়্যাতের অর্থ ও এর পদ্ধতিঃ
নিয়্যাতের আভিধানিক অর্থ হলো- (اَلْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ) ইচ্ছা, আকাংখা, দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদি। ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে- মহান আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার দিকে হৃদয় মনের লক্ষ্য আরোপ করা ও উদ্যোগ গ্রহণ করাকে নিয়্যাত বলে।
'আল্লামাহ খাত্তাবী (রহ.) নিয়্যাতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ

www.pathagar.com

هُوَ قَصْدُكَ الشَّيْئَ بِقَلْبِكَ وَ تَحَرِّيُ الطَّلَبِ مِنْكَ .

নিয়্যাত হলো- তুমি তোমার মনে কোন কাজের সদিচ্ছা পোষণ করবে এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

'আল্লামা বাইদাবী (রহ.) বলেন:

اِنْبِعَاثُ الْقَلْبِ نَحْوَ مَا يَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرَضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ حَالًا أَوْ مَآلاً .

বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতের কোন উপকার লাভ বা কোন ক্ষতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তার অনুকূল কাজের জন্য মনের যে উদ্যোগ তাকেই নিয়্যাত বলে।

মোটকথা কোন কাজের পেছনে মানব মনে যে উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে তাকেই নিয়্যাত বলা হয়। নিয়্যাতের মূল স্থান হলো ব্যক্তির অন্তর। ব্যক্তি অন্তরে যা টার্গেট করে সেটিই তার আসল নিয়্যাত। যে কোন 'ইবাদাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য এবং তা মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এই নিয়্যাতই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; মৌখিক নিয়্যাত নয়। ইসলামী জীবন বিধানে কেবলমাত্র হাজ্জ এবং 'উমরাহ ছাড়া অপর কোন 'ইবাদাতেই মৌখিক নিয়্যাতের বিধান প্রমাণিত নয়। হাজ্জ এবং 'উমরার ইহরাম বাধার সময় মুখে উচ্চারণ করে বলতে হয়- (لَبَّيْكَ حَجًّا – لَبَّيْكَ عُمْرَةً) হে প্রভু! আমি তোমার কাছে হাজ্জের / 'উমরার উদ্দেশ্যে হাযির হয়েছি। এছাড়া অন্য কোন 'ইবাদাতেই মৌখিক নিয়্যাতের কোন ভিত্তি নেই। বরং মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, আমি এখন অমুক কাজটি করব। আর এটিই হলো নিয়্যাত।

সঠিক নিয়্যাতের জন্য সঠিক 'ইলম জরুরী:

'ইলম হলো আমলের পূর্বশর্ত। 'ইলম না থাকলে আমল করা যায় না। 'ইলম সঠিক না হলে আমলও সঠিক হয় না। 'ইলম অর্জনকে তাই ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সেই 'ইলম যাতে সঠিক হয় সে ব্যাপারেও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

যার 'ইলম (জ্ঞান) আছে তাকে বলা হয় 'আলিম (জ্ঞানী)। মহান আল্লাহ 'আলিমের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

"তোমাদের মধ্যে যারা মু'মিন আর যারা 'আলিম (জ্ঞানী), মহান আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। আর তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন"।[২১] অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ .

"(এ লোকের চাল-চলনই ভালো, না ঐ ব্যক্তির যে) আদেশ পালন করে চলে, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সাজদাহ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমতের আশা করে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে"।[২২]

আবার যার 'ইলম যত বেশি তার জিজ্ঞাসাবাদও তত বেশি। 'ইলম অনুযায়ী আমল করতে না পারাও আরেক বিপদ। আমল বিহীন 'ইলম ফলবিহীন গাছের ন্যায়। ফলবিহীন গাছের চেয়ে ফলবান গাছের যেমন মূল্য বেশি, আমলবিহীন 'আলিমের চেয়েও তেমনি আমলদার 'আলিমের মূল্য বেশি। আর তাই জাহিল (মূর্খ) ব্যক্তি কোন অন্যায় করলে তেমন চোখে লাগে না; কিন্তু 'আলিম ব্যক্তি অন্যায় করলে তা খুবই চোখে পড়ে। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) বলেন:

قَلِيْلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرِ الْعِبَادَةِ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إِذَا عَبَدَ اللهَ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلاً إِذَا أَعْجَبَ بِرَأْيِهِ، وَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلاَنِ: مُؤْمِنٌ وَجَاهِلٌ فَلاَ تُؤْذِ الْمُؤْمِنَ وَلاَ تُحَاوِرِ الْجَاهِلَ .

না জেনে বেশি 'ইবাদাত করার চেয়ে জেনে বুঝে অল্প 'ইবাদাত করা উত্তম। প্রকৃত ফাকীহ সেই যে বুঝে শুনে 'ইবাদাত করে। আর প্রকৃত জাহিল সেই যে নিজেকে পন্ডিত মনে করে। মানুষ দু' রকম: মু'মিন এবং জাহিল। অতএব তুমি মু'মিনকে কখনো কষ্ট দিও না; আর জাহিলের সাথে বিতর্ক করো না।[২৩]

عن هَرِمِ بن حَيَّانَ انه قال: إِيَّاكُمْ وَالْعَالِمَ الْفَاسِقَ فَبَلَغَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيهِ وَأَشْفَقَ مِنْهَا مَا الْعَالِمُ الْفَاسِقُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيهِ هَرِمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهِ إِلاَّ الْخَيْرَ يَكُونُ إِمَامٌ يَتَكَلَّمُ بِالْعِلْمِ وَيَعْمَلُ بِالْفِسْقِ فَيُشْبِّهُ عَلَى النَّاسِ فَيَضِلُّوْنَ .

---

২১. আলকোরআন: সূরা আল মুজাদালাহ, ৫৮:১১

২২. আলকোরআন: সূরা আয্ যুমার, ৩৯:৯

২৩. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১০, পৃ. ৬৭, হাদীস নং- ২৮৭৯৪

হারিম ইবনু হাইয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'তোমরা ফাসিক 'আলিমদের থেকে বেঁচে থাকবে'। তার এই কথা যখন 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) কানে পৌঁছল, তিনি তাকে লিখে পাঠালেন এবং (বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে) ফাসিক 'আলিম বলতে তিনি কাদেরকে বুঝিয়েছেন তা জানতে চাইলেন। (রাবী বলেন) অত:পর হারিম তাঁকে জবাব লিখলেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর কসম, এর দ্বারা আমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই। 'আলিম ব্যক্তি সমাজের ইমাম হন এবং তার 'ইলম অনুযায়ী মানুষের মাঝে কথা বলেন। এরপর তার আমলে যদি ফাসিকী প্রকাশ পায় তাহলে তা মানুষের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং তারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়।[২৪]

'ইলম না থাকলে মানুষ সহজে আমল করতে পারে না। আর সঠিক 'ইলম থাকলে আমল করা সহজ হয়। তাই 'ইলম থাকা সত্ত্বেও আমল না করা বড় অপরাধ। যারা প্রকৃত 'আলিম তারাই সঠিক আমল করেন এবং আল্লাহকে বেশি ভয় করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা 'আলিম তারাই আল্লাহকে ভয় করে। নি:সন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল"।[২৫] আর মহান আল্লাহর কাছে তাঁরাই বেশি মর্যাদাবান যাঁরা তাঁকে বেশি ভয় করে। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র বানিয়েছি। যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই বেশি মর্যাদাবান, যারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে। অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন"।[২৬]

অতএব সাহীহ 'ইলম অর্জন করে প্রকৃত 'আলিম হওয়া যেমন জরুরী, নিজের 'ইলম অনুযায়ী আমল করাও তেমনি জরুরী। 'ইলম না থাকলেও যেমন চলবে না, যতটুকু 'ইলম আছে সে অনুপাতে আমল না করলেও চলবে না। যার যার

---

২৪. সুনানুদ দারিমী, খ. ১, পৃ. ১০২, হাদীস নং- ৩০০

২৫. আলকোরআনঃ সূরা ফাতির, ৩৫:২৮

২৬. আলকোরআনঃ সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:১৩

www.pathagar.com

'ইলম অনুযায়ী কে কতটুকু আমল করলো তাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সঠিক 'ইলম থাকলেই কেবল সঠিক নিয়্যাত করা যাবে। আর সঠিক নিয়্যাত করতে পারলেই সঠিক ফল পাওয়া যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ- (১) দুইজন ব্যবসায়ী নিজেদের ব্যবসার কাজে ঢাকা থেকে সফর করে সিলেটে গেলো। তারা দু'জনেই সেখানে গিয়ে শাহ জালাল (রহ.) এর কবর যিয়ারাত করলো। তবে তাদের একজন শারী'আর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ায় সে তার ব্যবসাকেই সফরের টার্গেট বানালো। আর অপরজন শারী'আর সঠিক জ্ঞান না থাকায় শাহ জালাল (রহ.) এর কবরকে যিয়ারাত করাকেই নিজের সফরের প্রধান টার্গেট স্থির করলো। এমতাবস্থায় প্রথমজন তার পুরো সফরকেই 'ইবাদাতে পরিণত করতে পারলো। পক্ষান্তরে অপরজন জ্ঞানের কমতি এবং বিভ্রান্তির কারণে বিদ'আতে লিপ্ত হলো।

(২) দুইজন নামাযী রিকশাওয়ালা বর্ষার দুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রাজপথে রিকশা চালাচ্ছিল। আশেপাশে অযূর ব্যবস্থা এবং মাসজিদ না থাকায় তাদের যোহরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার উপক্রম। একজন নিয়্যাত করলো যে, বৃষ্টির পানিতে আমার অযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যে ভিজছে তাতে যেন আমার অযূ হয়ে যায়। এরপর সে রিকশা থামিয়ে কিবলামুখী হয়ে নিজের রিকশার সিটে বসেই নামায আদায় করে নিল। আরেকজন জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তা করল না; ফলে তার সময়মত নামায পড়াও হলো না।

হাদীসের শিক্ষা:

- মনের অভ্যন্তরে কাজের যে লক্ষ্য স্থির করা হয় তাই নিয়্যাত।
- ছোট এবং বড় সকল কাজের ব্যাপারেই সুস্পষ্ট নিয়্যাত থাকতে হবে।
- হিজরাত একটি কষ্টসাধ্য মৌলিক 'ইবাদাত।
- দীন ও ঈমান রক্ষার্থে হিজরাতের বিধান কিয়ামাত পর্যন্ত চালু থাকবে।
- 'ইবাদাত যত কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন নিয়্যাত সঠিক না হলে তা নিষ্ফল হতে বাধ্য।
- কাজ ভাল হলেও নিয়্যাত ভাল নাও হতে পারে।
- শারী'আত বিরোধী কোন কাজ ভাল নিয়্যাতে করাও জায়িয নয়।
- আমল বিহীন 'ইলম ফলবিহীন গাছের ন্যায়।
- 'ইলম সঠিক না হলে আমলও সঠিক হয় না।
- না জেনে বেশি 'ইবাদাত করার চেয়ে জেনে বুঝে অল্প 'ইবাদাত করা উত্তম।

www.pathagar.com

- ব্যক্তি তার 'ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করলো তাও তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।
- সঠিক 'ইলম থাকলেই সঠিক নিয়্যাত করা যায়। আর সঠিক নিয়্যাত করতে পারলেই সঠিক ফল পাওয়া যাবে।
- হাজ্জ এবং 'উমরাহ ছাড়া অন্যান্য 'ইবাদাতে মৌখিকভাবে নিয়্যাত করা সাহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।
- মহান আল্লাহ মানুষের অন্তর এবং তার বাস্তব কর্মের দিকেই দৃষ্টিপাত করে থাকেন।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি ছিলেন (جَوَامِعُ الْكَلِم) 'জাওয়ামি'উল কালিম'। অর্থাৎ তিনি এমন শব্দ চয়নে কথা বলতেন যাতে অনেক অর্থের সমাহার থাকতো।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে আলোচ্য হাদীসের শিক্ষাগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেদের সকল কাজে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্য বানাবার তাওফীক দান করুন। এই বিষয়গুলোর আলোকে বাস্তব জীবনকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে নিজেদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথকে সুগম করুন। আমীন।।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ২

মুনাফিকের আলামত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ .

সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হলে সে তা খিয়ানাত করে।[২৭]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে

---

২৭. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস নং- ৫৯

www.pathagar.com

রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে মুনাফিকের স্বভাব বা মুনাফিকীর নিদর্শন আলোচনা করা হয়েছে। নিফাক একটি মারাত্মক ও গোপন ব্যাধি। এ ব্যাধি মুসলিম সমাজের শান্তি-শৃংখলাকে অঙ্কুরে বিনাশ করে দেয়। এটি দূরারোগ্য ক্যান্সারের ন্যায় মানবচরিত্রে লুকায়িত থাকে। প্রকাশ্যে দেখা যায় না বলে এর কোন প্রতিষেধকও ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু আলামত বা নিদর্শন বর্ণনা করে আমাদেরকে তা থেকে সাবধান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সময়েও মুনাফিক ছিল। এবং তারা মুসলিম সমাজের অন্যান্যদের সাথে প্রকাশ্যে ইসলামের বাহ্যিক অনুশাসনগুলো মেনেও চলত। এমনকি তারা মাসজিদে নাবাবীতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাথে জামা'আতে নামায আদায় করত।

প্রকাশ্যে এরূপ আচরণ দেখালেও তারা ভিতরে ভিতরে ইসলামের মারাত্মক দুশমন ছিল। সুযোগ পেলেই ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করতে দ্বিধাবোধ করত না। ইসলামের প্রতি তাদের দুশমনি ও কাফিরদের সাথে তাদের গোপন সখ্যতা বর্ণনা করে মুসলিম সমাজে এর মারাত্মক প্রভাব ও পরকালে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরে আলকোরআনে একটি স্বতন্ত্র সূরা সন্নিবেশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আলকোরআনের অন্যান্য স্থানেও তাদের কুকীর্তি বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً .

"নি:সন্দেহে মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হবে। এবং তুমি তাদের কোন সাহায্যকারীও (দেখতে) পাবে না"।[২৮]

এ প্রসঙ্গে সাহীহ মুসলিমে 'বাবু বায়ানি খিসালিল মুনাফিকি' বা 'মুনাফিকদের স্বভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে' আলাদা অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। রাসূলের মাক্কী যুগে এই শ্রেণির লোকদের অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য তখন কোন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনের সুযোগও ছিল না। মাদানী যুগের শুরু থেকেই তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাই আলকোরআনের মাদানী সূরাসমূহে এদের চরিত্র, অনিষ্ট এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইতিহাসের পরিক্রমায় আজো তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলে আসছে। মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব রেখে তারা নিজেদের ফায়দা লুটার চেষ্টা করে। অপরদিকে কাফিরদের সাথে গোপন আঁতাত করে ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর থাকে। এ কারণেই কোরআন এবং সুন্নাহয় এদেরকে মুসলিমদের মারাত্মক শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, এদের প্রতি কঠোর হওয়ার ও এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিককে চেনার কয়েকটি আলামত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন মুনাফিককে চেনার উপায় হলো তিনটি। যথা- মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাতের খিয়ানাত করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে এ তিনটি নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে সেই মুনাফিক। অবশ্য এগুলো ছাড়াও মুনাফিকের আরো কিছু নিদর্শন রয়েছে। যেমন- সাহীহুল বুখারীর বর্ণনায় এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

---

২৮. আলকোরআনঃ সূরা আন্ নিসা, ৪:১৪৫

www.pathagar.com

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে সে (পরিপূর্ণ) মুনাফিক (বলে গণ্য) হবে। অথবা (তিনি এভাবে বলেছেন) যে ব্যক্তির মধ্যে এ চারটির কোন একটি স্বভাব থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকীর চরিত্র থাকবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। (আর সে চারটি স্বভাব হলো) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, যখন চুক্তি করে তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে আর যখন বাকবিতণ্ডা করে তখন অকথ্য ভাষায় গালি দেয়।[২৯]

সাহীহ মুসলিমে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

عن عبد الله بن عَمْرٍو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَرْبَعٌ من كُنَّ فيه كان مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كانت فيه خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كانت فيه خَلَّةٌ من نفاق حتى يَدَعَهَا إذا حَدَّثَ كَذَبَ وإذا عَاهَدَ غَدَرَ وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ وإذا خَاصَمَ فَجَرَ غير أَنَّ في حديث سُفْيَانَ وَإِنْ كانت فيه خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كانت فيه خَصْلَةٌ من النِّفَاقِ .

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: এমন চারটি স্বভাব আছে যা কোন ব্যক্তির মধ্যে থাকলে সে পরিপূর্ণ মুনাফিক (বলে গণ্য) হবে। আর যে ব্যক্তির মধ্যে এ চারটির কোন একটি স্বভাব থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকীর চরিত্র থাকবে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। (আর সে চারটি স্বভাব হলো) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন চুক্তি করে তখন বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন সে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে আর যখন বাকবিতণ্ডা করে তখন অকথ্য ভাষায় গালি দেয়। তবে সুফইয়ানের বর্ণনায় (খুল্লাতুন) এর স্থলে 'খাসলাতুন' এসেছে। যদি তার মধ্যে এই চারটির কোন একটি খাসলাত/স্বভাব থাকে তাহলে তার মধ্যে নিফাকের একটি খাসলাত/স্বভাব থাকল।[৩০]

অতএব নিফাকী স্বভাব শুধু তিনটিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি আরো অনেক। সাহীহ মুসলিমেই আবূ হুরাইরাহ (রা.) বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

---

২৯. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৮৬৮, হাদীস নং- ২৩২৭

৩০. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস নং- ৫৮

www.pathagar.com

'মুনাফিকের আলামতসমূহের মধ্যে তিনটি হলো- যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখা হলে খিয়ানাত করে'। অর্থাৎ মুনাফিকের নিদর্শন এগুলো ছাড়াও আরো আছে। তবে এ হলো তিনটি প্রসিদ্ধ আলামত। আর এ আলামতগুলো বহন করার পাশাপাশি নামায রোযা ইত্যাদি বাহ্যিক 'ইবাদাত প্রতিপালন করা সত্ত্বেও সে মুনাফিক বলেই গণ্য হবে। সাহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় তাই মুনাফিকের এই লক্ষণগুলো বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আরেকটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো-

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

'মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং মনে করে যে সে মুসলিম'।[৩১]

নিফাক এর অর্থ ও এর প্রকারভেদ:

নিফাক আরবী শব্দ। এর বাংলা প্রতিশব্দ কপটতা। নিফাক হলো অন্তরে কুফরী ধারণা লুকিয়ে রেখে মুখে অথবা বাস্তব কর্মে ইসলামকে প্রকাশ করা। যারা এমনটি করে তাদেরকে আরবীতে বলা হয় 'মুনাফিক' আর বাংলায় বলা হয় কপট। মুনাফিক এর মূল বর্ণ হলো (নূন, ফা এবং কাফ)। এখান থেকে نَفَقَ نَفْقًا (নাফাকা, নাফকান) অর্থ মাটির মধ্যে গর্ত করা। নাফিক বলতে ঐ বন্য ইঁদুরকে বুঝায় যা এমন গর্তে প্রবেশ করেছে যার একটি প্রবেশ পথ ও একটি বহির্গমন পথ রয়েছে। মুনাফিক লোকদেরকেও তেমনি তাদের দ্বিমুখিতার কারণে মুনাফিক বলা হয়। তারা মুসলিমদের সামনে এক রকম কথা বলে আর কাফিরদের সামনে বলে ভিন্ন রকম। আলকোরআন তাদের দ্বিমুখী চরিত্র উন্মোচন করে দিয়ে বলছে-

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.

"যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশাই করে থাকি"।[৩২]

---

৩১. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস নং- ৫৯

৩২. আলকোরআনঃ সূরাতুল বাকারাহ, ২:১৪

www.pathagar.com

এই নিফাক দুই প্রকার : যথা-

১. নিফাক ই'তিকাদী বা 'আকীদাহ বিশ্বাসগত নিফাক : যথা- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলা, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার কোনটিকে মিথ্যা বলা, তাঁর সাথে শত্রুতা বা বিদ্বেষ পোষণ করা, তাঁর আনীত কোন বিষয়ের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা, ইসলামের ক্ষতি হলে খুশি হওয়া এবং ইসলামের বিজয়ে হিংসা কিংবা ঘৃণা করা ইত্যাদি।

২. নিফাক 'আমালী বা বাস্তব কর্মগত নিফাক। যথা- আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি মন্দ স্বভাব ও আচরণ।

হাদীসের শিক্ষা:

- কথা এবং কাজে মিল থাকা ঈমানের অনিবার্য দাবী।
- মিথ্যা বলা জঘণ্য অপরাধ এবং এটি মুনাফিকীর অন্যতম লক্ষণ।
- ওয়াদা পূরণে সচেষ্ট থাকা মু'মিনের অন্যতম গুণ।
- প্রকৃত মু'মিনরা আমানাতের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকে।
- চুক্তি ভঙ্গ করা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা মুনাফিকীর লক্ষণ।
- ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্যের সময়ও মু'মিন অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে না।
- এসব মন্দ চরিত্র লালন করলে নামায-রোযা পালন করা সত্ত্বেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।
- মুসলিমদের উচিত মুনাফিকদের দূরভিসন্ধি, চরিত্র ও আচরণের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত মু'মিন হওয়ার এবং মুনাফিকদের ব্যাপারে সাবধান থাকার তাওফীক দিন। মুনাফিকদের চরিত্রগুলো বর্জন করে খাঁটি মু'মিন হওয়ার মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৩

কাকে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।[৩৩]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশিষ্ট খাদিম ও একনিষ্ঠ সহচর। আনাস তাঁর মূল নাম, আর উপনাম হলো আবূ হামযাহ ও আবূ সুমামা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'হামযাহ' নামক এক প্রকার সবজি খুটতে দেখে আদর করে বলেন- 'ইয়া আবা হামযাহ'। সেই থেকে তাঁর ডাক নাম হয়ে যায় আবূ হামযাহ। তাঁর মাতা হলেন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী 'উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান' (রা.)। ইয়াসরিবের বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গোত্রটিই ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আনাস (রা.) এর পিতা মালিক ইবনু নাদর এবং মাতা উম্মু সুলাইম সাহলা বিনতু মিলহান আলআনসারিয়্যাহ। উম্মু সুলাইম (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খালা হতেন।

আনাসের (রা.) এক চাচা আনাস ইবনু নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর দেহ কেটে কুটে বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে

---

৩৩. সাহীহুল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ১৫ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬৭, হাদীস নং- ৪৪

www.pathagar.com

পারেনি। আনাস (রা.) বলতেন: আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল।[৩৪] আনাসের (রা.) বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং কুফরী অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর মা খাযরাজ গোত্রের বিত্তশালী ব্যক্তি আবূ তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বালক আনাসকেও সাথে করে তিনি আবূ তালহার বাড়িতে নিয়ে যান। এবং সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একান্ত সংস্পর্শে ছিলেন। ফলে অতি কাছে থেকে তাঁর অনেক কথা শুনা ও অনেক কাজ লক্ষ্য করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) নিজেই বলেন: আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালিগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে'। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে এই ওয়াসিয়াতটি করেন: ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মৃত্যুর পর আনাস (রা.) তাঁর গোটা জীবন হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬ টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ১৬৮ টি। বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন যে, দশ বছর বয়সে আমার মাতা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খিদমাতে পাঠান। তখন থেকে দশ বছর ধরে আমি তাঁর খিদমাতে নিয়োজিত থাকি। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যখন ইন্তিকাল হয়, তখন আমার বয়স বিশ বছর।

---

৩৪. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৮৩

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খালীফাহ 'উমার (রা.) এর শাসনকালে তিনি বসরায় চলে যান এবং সেখানে দীনি 'ইলম শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকেন। অত:পর ৯১ হিজরীতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবং তিনিই ছিলেন বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে কাকে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাধিক ভালোবাসা একজন মু'মিনের কাছে তার ঈমানের দাবী। কোন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার দাবী তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হবে যখন সে দুনিয়ার অন্য সকলের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালোবাসবে। এ বিষয়ে আনাস (রা.) বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য।

শুধু তাই নয়, একজন মু'মিনের কাছে তার ঈমানের দাবী হলো- কেবল অন্য সব মানুষের চেয়ে নয় বরং তার নিজের চেয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালোবাসা। একবার 'উমার (রা.) এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে 'উমার (রা.) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে (আমার নিজেকে ছাড়া) দুনিয়ার সকলের চেয়ে অধিক ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর কসম! হে 'উমার, তুমি এখনো মু'মিন হতে পারনি। বিনীত কণ্ঠে 'উমার (রা.) শুধালেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তাহলে কী করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানালেন: তোমাকে তোমার নিজের চেয়েও আমাকে অধিক ভালোবাসতে হবে। 'উমার (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এখন থেকে আপনি আমার কাছে আমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: (الْآنَ يَا عُمَرُ) 'হে 'উমার! এতক্ষণে তুমি মু'মিন হলে'।[৩৫] 'উমার (রা.) এর এ ঘটনায় আরো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাধিক ভাল না বেসে কেউ ঈমানের দাবীদার হলে তার দাবী সঠিক নয়।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার সর্বোত্তম নমুনা হলো, তাঁর আনীত আদর্শের পুংখানুপুংখ অনুসরণ করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত বিধানকেই অনুকরণীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহও

---

৩৫. সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩৪৯১

www.pathagar.com

চান যে, একজন মু'মিন এভাবেই তাঁর রাসূলকে ভালোবাসুক। এজন্যেই তিনি তাঁর নিজের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টিকে নাবীর ভালোবাসার উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"(হে নাবী!) আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবীদার হয়ে থাক, তবে আমার অনুকরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। এবং তোমাদের গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[৩৬]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ আরো ঘোষণা করছেন:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

"আপনার রবের কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের ভিতরকার ব্যাপারাদি নিরসনে আপনাকে বিচার ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে। অত:পর আপনার ফায়সালার ব্যাপারে মনের মধ্যে কোন প্রকার ইতস্তত: বোধ করবে না এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।"[৩৭]

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতে হবে সর্বাধিক। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসা না থাকলে মু'মিনই হওয়ার দাবী করা যাবে না। তাই একজন মু'মিনের জীবনে এই হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি একজন মু'মিনের ভালোবাসা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন তা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন যে, একজন মু'মিন স্বভাবজাতভাবে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা পোষণ করে থাকে, আমার প্রতি তার ভালোবাসা হবে এর চেয়েও ব্যতিক্রম। অন্যদের প্রতি তার ভালোবাসার ক্ষেত্রে বৈষয়িক

---

৩৬. আলকোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৩১

৩৭. আলকোরআন: সূরা আন্-নিসা, ৪:৬৫

www.pathagar.com

কোন স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু আমার প্রতি তার ভালোবাসা হবে ঈমানী ভালোবাসা, যা পরকালীন সফলতা ও বিফলতা নির্দেশ করে। তাই অন্য যে কারো তুলনায় সে যদি আমাকে অধিক ভাল না বাসে, তাহলে সে প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই প্রথমেই না বোধক ঘোষণার মাধ্যমে কথাটি শুরু করে বলেছেন- তোমাদের কেউ মু'মিন বলে গণ্যই হবে না, যদি সে আমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালো না বাসে। এরপর তিনি দুনিয়ায় যাদের প্রতি সচরাচর মানুষের অধিক ভালোবাসা হয়ে থাকে, তাদের কথা বিবৃত করেছেন। ফলে বক্তব্যটি আরো জোড়ালো হয়েছে। তাছাড়া অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অধিক ভালোবাসা ঈমানের স্বাদ প্রাপ্তির প্রধান উপকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে যে,

عن أَنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثَلَاثٌ من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليه مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إلا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ كما يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ .

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সেই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। এক. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যার কাছে অন্য সকলের চেয়ে অধিক প্রিয়। দুই. যে কাউকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই ভালোবাসে। এবং তিন. যে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দ করে।[৩৮]

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালোবাসার বিষয়টি শুধু কি মুখে দাবী করলেই হবে? এর জন্য সঠিক পন্থা ও পদ্ধতি জেনে নেয়াও তাই ঈমানেরই দাবী। কেননা এটি ছাড়া নিজেকে বিশুদ্ধ ঈমানদার বানানো সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার সঠিক পন্থা:

ঈমানের দাবী অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে এর সঠিক পন্থা জেনে নিতে হবে।

---

৩৮. সাহীহুল বুখারী, বাবু হালাওয়াতিল ঈমান, খ. ১, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ১৬

www.pathagar.com

আর এ পন্থা বলে দেয়ার অধিক হকদারও তিনি নিজেই। এক্ষেত্রে একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারেন কেবল তাঁর সাহাবীগণই। যাঁরা বাস্তবিক পক্ষেই তাঁকে নিজেদের জীবনের চেয়েও অধিক ভাল বেসেছেন। যাঁরা তাঁদের জান ও মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রদর্শিত পন্থায় বিলিয়ে দিয়ে তাঁর আনীত আদর্শকে সমুন্নত করেছেন। নিজেদের জানের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর জান, নিজেদের মতের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মতকে প্রাধান্য দিয়ে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন।

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিশিষ্ট সাহাবী 'আমর ইবনু আল-জামুহ (রা.) এর স্ত্রী 'হিন্দ' (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পথে লোকেরা তাকে জানাল যে, তোমার স্বামী, তোমার ছেলে ও তোমার ভাই শহীদ হয়েছেন। তিনি সকলের মৃত্যুর কথা শুনেই 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন এবং ধৈর্য ধারণ করলেন। প্রতিবারই তিনি জিজ্ঞেস করলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খবর কি? যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে আছেন তখনই তিনি সান্ত্বনা পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার এর চেয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে? তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যথার্থ অনুকরণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একমাত্র সেসব সাহাবীদেরই পদাংক অনুসরণ করতে হবে।

ভালবাসার স্থান অন্তরের কুটিরে। এটি মনের অভ্যন্তরের লুকায়িত বিষয়। শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখে প্রকৃত ভালবাসা বুঝার উপায় নেই। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি অন্তরে প্রোথিত ভালবাসার বহি:প্রকাশ ঘটাতে হবে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের যথাযথ অনুকরণের মাধ্যমে। তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে। তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরুদ ও সালাম প্রেরণের মাধ্যমে। আর এ সব কিছুর সঠিক পন্থা জেনে নিতে হবে মহাগ্রন্থ আলকোরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিশুদ্ধ হাদীস থেকে। কেননা অন্যান্য 'ইবাদাতের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসাও একটি মৌলিক 'ইবাদাত। তাই নিজের ইচ্ছামত এই ভালবাসার বহি:প্রকাশ ঘটালে তা হবে হয় পক্ষপাতদুষ্ট, নয় অতিরঞ্জিত।

www.pathagar.com

হাদীসের শিক্ষা:

- পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসা সহজাত বিষয়।
- দুনিয়ার মানুষদের প্রতি ভালোবাসা হতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।
- দুনিয়ার যে কারো চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি অধিক ভালোবাসা রাখতে হবে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালোবাসা তাঁর আদর্শের অনুকরণের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে হবে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালোবাসার উত্তম নমুনা তাঁর সাহাবীগণের জীবনীতেই পাওয়া যাবে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে বলেছেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তা করা এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন শত মন চাইলেও তা না করে থাকাই রাসূলকে অধিক ভালোবাসার বাস্তব নমুনা।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাদীসটির শিক্ষা কাজে লাগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসার তাওফীক দান করুন। আর এই ভালোবাসার বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে নিজেদের সার্বিক জীবনে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের যথার্থ অনুসরণ করার যোগ্যতা দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৪

সময়মত সালাত আদায়ের অপরিহার্যতা

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

ইবনু মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহান আল্লাহর কাছে কোন্ কাজটি সবচেয়ে প্রিয়? তিনি জবাব দিলেন, যথাসময়ে নামায পড়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি জবাব দিলেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্টি? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।)[৩৯]

হাদীসটির বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনাকারী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)। তাঁর মূল নাম 'আব্দুল্লাহ। পিতার নাম মাস'ঊদ, কুনিয়াত আবূ 'আবদির রহমান এবং মাতার নাম উম্মু 'আব্দ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদিম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে সাথে ছিলেন। এ কারণে হাদীস বর্ণনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন একজন কিশোর। কোরাইশ গোত্রের এক সর্দার 'উকবা ইবনু আবূ মু'ইতের একপাল ছাগল নিয়ে তিনি মাক্কার গিরিপথগুলোতে চরিয়ে বেড়াতেন। লোকেরা তাকে 'ইবনু উম্মি 'আব্দ' বলে

---

৩৯. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২২২৭, হাদীস নং- ৫৬২৫ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৯০, হাদীস নং- ৮৫

www.pathagar.com

ডাকতো। নাবীজীর সাথে তার প্রথম সাক্ষাত এবং ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি প্রতিদিন সকালে 'উকবার ছাগলের পাল নিয়ে বের হয়ে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, দু'জন বয়স্ক লোক, যাদের চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ বিরাজমান, দূর থেকে তার দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ছিলেন খুবই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। পিপাসায় তাঁদের গলা ও ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নিকটে এসে লোক দু'টি তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, তোমার ছাগলগুলো থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দাও। আমরা তা পান করে আমাদের পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং আমাদের শুকনা গলা একটু ভিজিয়ে নিই।

তাঁদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ছাগলগুলি তো আমার নয়। আমি এগুলির রাখাল ও আমানাতদার মাত্র'। লোক দু'টি এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং তাদের মুখমন্ডলে উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠলো। তাদের একজন আবার বললেন: 'তাহলে এমন একটি ছাগী আমাকে দাও যা এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি'। ইবনু মাস'ঊদ তখন নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট ছাগীর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ছাগীটি ধরে ফেলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে হাত দিয়ে ধরে তার ওলান মলতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে ইবনু মাস'ঊদ অবাক বিস্ময়ে মনে মনে বলছিলেন: 'কখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি এমন ছাগী কি দুধ দেয়? কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগীর ওলানটি ফুলে উঠে এবং প্রচুর পরিমাণে দুধ বের হতে থাকে। দ্বিতীয় লোকটি গর্তবিশিষ্ট পাথর উঠিয়ে নিয়ে বাঁটের নিচে ধরে তাতে দুধ ভর্তি করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পান করেন এবং তাকেও পান করান। ইবনু মাস'ঊদ বলেন: আমি যা দেখছিলাম তা সবই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন সেই পুণ্যবান লোকটি ছাগীর ওলানটি লক্ষ্য করে বল্লেন: 'চুপসে যাও'। আর অমনি সেটি পূর্বের ন্যায় চুপসে গেল। তারপর আমি সেই পুণ্যবান লোকটিকে অনুরোধ করলাম: 'আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: তুমি তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক। এই পুণ্যবান লোকটিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.)। ইবনু মাস'ঊদ (রা.) এর কাছে সেদিন যেমনি এই পুণ্যবান লোক দু'টিকে ভাল লেগেছিল, তাঁদের কাছেও তেমনি ছেলেটির আচরণ, আমানাতদারী ও বিচক্ষণতা খুব চমৎকার মনে হয়েছিল। তাঁরা ছেলেটির মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভলক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ ঘটনার কিছুদিন পরেই 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন একনিষ্ঠ খাদিম হিসেবে উৎসর্গ করেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) ছায়ার মত নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করতেন। সফরে বা ইকামাতে, গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে সব সময় তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমালে তিনি তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতেন, গোসলের সময় পর্দা করতেন, বাইরে যাবার সময় জুতা পরিয়ে দিতেন, ঘরে প্রবেশের সময় জুতা খুলে দিতেন এবং তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করতেন। হুজরায় অবস্থানকালেও তিনি তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সকল বিষয়ে তাকে অবগত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'সাহিবুস সির' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল গোপন বিষয়ের অধিকারী বলা হতো।

তিনি সুললিত কণ্ঠে আলকোরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনিই প্রথম মাক্কায় কাফিরদের সামনে প্রকাশ্যে আলকোরআন তিলাওয়াত করেন। 'উমার (রা.) বলেন: একদিন রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আবূ বাকর (রা.) এর সাথে কথা বলছিলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। কিছু সময় পর আমরা বের হয়ে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি মাসজিদে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর কোরআন তিলাওয়াত শুনলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন: 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে- সে যেন ইবনু উম্মি 'আব্দের পাঠের অনুসরণে কোরআন পাঠ করে'। এরপর ইবনু মাস'ঊদ বসে দু'আ শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস্তে আস্তে তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন: 'চাও, দেয়া হবে, চাও, দেয়া হবে'। আলকোরআনের বিধানাবলী তিনি নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করে চলতেন। এক হাদীসে তিনি বলেন: আমরা আলকোরআনের দশটি আয়াতকে অতিক্রম করতাম না যতক্ষণ না সেই দশটি আয়াতকে বাস্তবে রূপায়ন করতাম। তিনি একাধারে ছিলেন হাফিয, মুহাদ্দিস এবং 'আবিদ। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দিয়ে আলকোরআন পাঠ করাতেন এবং নিজে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন।

ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাবশায় এবং পরে মাদীনায় হিজরাত করেন। ৩২ হিজরী মোতাবেক ৬৫২ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

আলোচ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব ও সময়মত সালাত আদায়ের অপরিহার্যতা আলোচনা করা হয়েছে এবং একে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরপর আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় বলা হয়েছে মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করাকে এবং তারপরে বলা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদকে। উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে প্রথমটি মহান আল্লাহর হক, দ্বিতীয়টি বান্দাহর হক এবং তৃতীয়টি এতদোভয়ের সমষ্টি। অর্থাৎ মহান আল্লাহর পছন্দ হলো যে, বান্দাহ তাঁর প্রতি ঈমান আনার পর ঈমানের বাস্তব নিদর্শন হিসেবে দৈনিক পাঁচবার তাঁরই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুক। নিজের পিতা-মাতা সহ অন্যান্য সকল মানুষের প্রতি সদাচরণকারী হোক। প্রথমটি তার কাছে মহান আল্লাহর হক এবং দ্বিতীয়টি বান্দাদের হক। আর তৃতীয়টি হলো এতদোভয়ের সমষ্টিগত হক। এই হকগুলো যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে একজন মু'মিন তার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। তাই বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটিতে মহান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ কোন্‌টি- এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়মত সালাত আদায়ের কথা বললেন। কেননা ঈমান আনয়নের পর একজন মু'মিনের উপর সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব বর্তায় তা হলো মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। আর এ সালাতকে সময়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দিন ও রাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে মহান আল্লাহর সাথে বান্দাহর কথোপকথন হয়, তাঁর আনুগত্যের পথে চলার ব্যাপারে বান্দাহ অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পরপর নিজ প্রভূ ও স্রষ্টার সাথে এভাবে দেখা সাক্ষাত ও অঙ্গীকারের ফলে বান্দাহ অন্যায় পথে পা বাড়াতে পারে না। শাইতানের খপ্পরে পরে কখনো কোন অন্যায়ে জড়িয়ে গেলেও পরবর্তী সালাত আবার তাকে স্রষ্টার সাথে কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই সময়মত সালাত আদায়ই হলো মহান আল্লাহর কাছে তাঁর বান্দাহর জন্য সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ।

এ পৃথিবীতে মাতা-পিতাই হলো সন্তানের সবচেয়ে বড় শুভাকাংখী এবং তাদের থেকেই সে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ পায়। তারা কখনো সন্তানের অকল্যান চান না। তাই তাদের আনুগত্যের পথে চললে সন্তান সবসময় সুখী হয়। আর তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলে সন্তানের অকল্যাণ হয়। মহাগ্রন্থ আলকারআনে তাই মহান আল্লাহর 'ইবাদাতের পরেই মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্ব ও আপন পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের মাধ্যমেই পৃথিবীময় শান্তি ও শৃংখলা নেমে আসা সম্ভব। এরপর এই শান্তিময় অবস্থাকে ধরে রাখতে এবং সর্বত্র তা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যে কাজটি করতে হয় তা হলো- মহান আল্লাহর পথে জিহাদ। ব্যক্তি জীবন কিংবা সমাজ জীবনে শান্তি-শৃংখলার পরিপন্থী যা কিছু বিরাজিত তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলারই অপর নাম হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।

সময়মত নামায পড়ার গুরুত্ব:

ঈমানের পর নামায ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তির ঈমানের যথার্থতা প্রমাণ করে তার নামায। যার নামায যত সুন্দর ও সঠিক, তিনি তত ভাল মু'মিন। নামায ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়। ইচ্ছাকৃত নামায বর্জন করতে থাকলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। কিন্তু এই নামায যে যার ইচ্ছামত যখন তখন পড়লে হবেনা। বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً .

"নিশ্চয় সুনির্দিষ্ট সময়ে মু'মিনদের জন্য নামাযকে অবধারিত করা হয়েছে"[৪০]।

ইচ্ছাকৃতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায আদায় না করা হলে তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। সমস্ত বাহ্যিক আমলের মধ্যে নামাযের স্থান সর্বপ্রথম। নামাযের মাধ্যমেই ব্যক্তির ঈমানের সত্যায়ন হয়। বিশেষ করে এ নামায যদি মাসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فإن الله يَقُوْلُ { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله}.

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: তোমরা যখন কাউকে নিয়মিতভাবে মাসজিদে যেতে দেখবে তখন তাকে মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহর মাসজিদসমূহকে তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে"।[৪১]

---

৪০. আলকোরআন: সূরা আন নিসা, ৪:১০৩

৪১. সুনান আদ্‌দারিমী, খ. ১, পৃ. ৩০২, হাদীস নং- ১২২৩

www.pathagar.com

নামায আদায় করলে ঈমানের দাবীতে সে সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হয়। আর ইচ্ছাকৃত নামায না পড়লে তার এ দাবী অসত্য বলে গণ্য হয়। তাই যারা সময়মত নামায আদায় করে তারাই সর্বোত্তম মু'মিন। মহান আল্লাহর কাছে তারাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। এবং তাদের পক্ষেই মহান আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশাবলীর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া সম্ভব। তাই যাদের নামায সঠিক, তাদের অন্যান্য সব কাজও সচরাচর সঠিক হয়ে থাকে। আর যাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা থাকে, তাদের অন্যান্য সব ধরনের দায়িত্ব পালনেও অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। নামায যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে। মহাগ্রন্থ আলকোরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .

"নিশ্চয় নামায যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে"[৪২]।

অর্থাৎ গুরুত্বের সাথে যথানিয়মে নামায আদায়কারী ব্যক্তি কখনোই অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে পারে না। তার নামাযই তাকে অন্যান্য পাপ-পংকিলতা থেকে মুক্ত রাখতে সহায়ক হবে। ফলে সে তার নামাযের মাধ্যমে একদিকে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। অপরদিকে যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে সে আল্লাহর ক্রোধ থেকেও বেঁচে যায়। এ কারণেই আলোচ্য হাদীসে সময়মত নামায আদায় করাকে মহান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতামাতার প্রতি সদাচরণ (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) এর মর্ম ও গুরুত্বঃ

আরবী 'আল-ওয়ালিদান' শব্দের অর্থ হলো পিতা-মাতা। আর 'বির্' হলো আনুগত্য, আদেশ পালন, সৎকাজ ও সদাচরণ ইত্যাদি। যদিও পিতামাতার সাথে আসলে শব্দটি সদাচরণকেই বুঝায়। সুতরাং 'বির্‌রুল ওয়ালিদাইন' এর অর্থ হলো- পিতামাতার আনুগত্য করা, তাদের আদেশ পালন করা ও সকল অবস্থায় তাদের সাথে সদাচরণ করার মাধ্যমে সৎকাজে নিয়োজিত থাকা।

পিতামাতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব অনেক বেশি। সৃষ্টিলোকের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরই পিতামাতার স্থান। আলকোরআনে মহান আল্লাহর 'ইবাদাতের পরপরই পিতামাতার আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আবার আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে বারণ করার পরপরই পিতামাতার

---

৪২. আলকোরআনঃ সূরা আল 'আনকাবূত, ২৯:৪৫

www.pathagar.com

প্রতি সদয় হতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ পিতামাতার আনুগত্য করা ইসলামের একটি মৌলিক 'ইবাদাত। আর পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করা মহান আল্লাহর সাথে শিরক এর নামান্তর।

মানব সন্তানের প্রতি তার পিতামাতার অনুগ্রহ অতুলনীয় ও অসীম। যেমনিভাবে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ তাঁর সৃষ্টিলোকের প্রতি অতুলনীয়, অগণিত ও অসীম। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির প্রতি যে অনুগ্রহ ও অনুকম্পা করেন এর বিপরীতে তিনি তাদের কাছ থেকে কখনোই কোন অনুগ্রহ ও অনুকম্পার মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু পিতামাতা তাদের সন্তানদের প্রতি যে অনুগ্রহ ও অনুকম্পা করেন, তারাও একসময় সন্তানদের কাছ থেকে অনুরূপ অনুগ্রহ ও অনুকম্পার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। বিশেষত: তারা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন তারাও অনেক সময় শিশুতূল্য অবস্থায় এসে দাঁড়ান। তারা মানসিকভাবে এটা আশা করেন যে, তাদের সন্তানরাও তাদের প্রতি অনুরূপ অনুগ্রহ করুক। শিশুকালে প্রতিটি মানব সন্তানের অবস্থা এমন থাকে যে, সে তার নিজের কি প্রয়োজন তাও বলতে পারে না। তার ক্ষুধা পেলেও সে কান্না করে, ঘুম পেলেও কান্না করে, আবার টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও সে কান্নাই করে। এমতাবস্থায় তার পিতামাতা তার পারিপার্শিক অবস্থা থেকে বুঝে নেন যে এখন তার কি প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন পূরণ করেন। পিতামাতা তার প্রতি এই অনুগ্রহটুকু না করলেও তার বলার অথবা বুঝার উপায় ছিলনা যে, কেন তারা তার প্রতি সদয় হচ্ছে না। পক্ষান্তরে পিতামাতা যখন বার্ধক্যে অনুরূপ অবস্থার শিকার হন তখন তারা কিন্তু ঠিকই বুঝেন যে, তাদের সন্তান সন্ততি রয়েছে, যাদের প্রতি তারা একসময় এভাবে অনুগ্রহ করেছিল। তাই এদের কাছ থেকে অনুরূপ সহানুভূতি পাওয়ার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। সুতরাং সন্তানদেরও উচিত এখন এমনিভাবে তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও সহানুভূতি দেখানো।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের সদাচরণের এহেন গুরুত্বের কারণেই আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও একে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসেও এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ وَأَنْ يُزَادَ فِيْ رِزْقِهِ فَلْيُبِرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি চায় যে, তার আয়ূ বৃদ্ধি করে দেয়া হোক এবং তার রিযিককে প্রশস্ত করা হোক, সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।[৪৩]

يُقَالُ لِلْعَاقِ: اِعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ فَإِنِّيْ لاَ أَغْفِرُ لَكَ، وَيُقَالُ لِلْبَارِّ: اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنِّيْ أَغْفِرُ لَكَ.

(হাশরের দিন) পিতা-মাতার অবাধ্যকে বলা হবে যে, তুমি যতই আনুগত্য করে থাক না কেন আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। আর পিতা-মাতার বাধ্যগত সন্তানকে বলা হবে যে, তুমি যাই আমল করেছো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।[৪৪]

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ السَّاخِطِ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ غَيْرَ ظَالِمِيْنَ لَهُ .

যে ব্যক্তির প্রতি ন্যায়সঙ্গতভাবে তার পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট, তার সালাত কবুল করা হবে না।[৪৫]

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ .

মাতা-পিতাকে গালমন্দ করা কবীরা গুনাহ। বলা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! মাতা-পিতাকে কি কেউ গালি দেয়? তিনি বললেন: হ্যাঁ দেয়। কেউ যখন অপর কাউকে তার বাবার নাম ধরে গালি দেয় তখন সেও পাল্টা তার বাবার নাম ধরে গালি দেয়। আবার কেউ যখন অপর কাউকে তার মায়ের নাম ধরে গালি দেয় তখন সেও পাল্টা তার মায়ের নাম ধরে গালি দেয়।[৪৬]

يَأْكُلُ الْوَالِدَانِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِمَا بِالْمَعْرُوْفِ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ وَالِدَيْهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.

---

৪৩. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১৬, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং- ৪৫৫২১
৪৪. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১৬, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং- ৪৫৫২৭
৪৫. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১৬, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং- ৪৫৫২৫
৪৬. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১৬, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং- ৪৫৫২৩

www.pathagar.com

সন্তানের মাল থেকে পিতা-মাতা (অনুমতি ছাড়াই) ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে পারবে। কিন্তু পিতা-মাতার মাল থেকে তাদের সন্তান অনুমতি ছাড়া খেতে পারবে না।[৪৭]

لِيَعْمَلِ الْبَارُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارَ ، وَلِيَعْمَلِ الْعَاقُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ .

পিতা-মাতার বাধ্যগত সন্তান আমলের কমতির কারণে জাহান্নামে যাবে না। আর পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান আমলের প্রতুলতা সত্ত্বেও জান্নাতে যাবে না।[৪৮]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব অপরিসীম। মাতা-পিতার প্রতি অসদাচরণ করলে 'ইবাদাতও কবুল হবে না; জান্নাতেও যাওয়া যাবে না। পিতা-মাতারও উচিত নয় সন্তানের প্রতি অন্যায়ভাবে অসন্তুষ্ট হওয়া।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর মর্মঃ

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ ইসলামের একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। ঈমান আনার পর ঈমানের দাবী অনুযায়ী চলতে গিয়ে একজন মু'মিনের জীবনে যত ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কোরবানী পেশ করতে হয় তা সবই এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ ঈমানী যিন্দিগীর যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলে গণ্য।

জিহাদ আরবী শব্দ। আরবী ভাষার শব্দ হলেও বাংলায় এটি বহুল প্রচলিত। শব্দটি 'জুহদুন' (ج ه د) মূল ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কষ্ট-ক্লেষ্ট, শক্তি-সামর্থ প্রয়োগ করা.. ইত্যাদি। এ অর্থেই আলকোরআনুল হাকীমে এসেছেঃ

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .

"তারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম করেছে।"[৪৯] তাই কোন বিষয়ে সাধারণ কোন চেষ্টা তদবীরের নাম জিহাদ নয়। বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রাণান্তকর চেষ্টা-প্রচেষ্টার নাম হলো জিহাদ।

---

৪৭. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১৬, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং- ৪৫৫২৬

৪৮. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১৬, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং- ৪৫৫২৮

৪৯. আলকোরআনঃ সূরা আল আন'আম, ৬:১০৯

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকার নেক আমলকেও হাদীসে জিহাদ বলা হয়েছে। বিশেষ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে কিংবা সত্য কথা বলতে গিয়ে যেসব যক্কী-ঝামেলা পোহাতে হয় তা সবই জিহাদ তূল্য। বরং তা সর্বোত্তম জিহাদ হিসেবে গণ্য। বর্ণিত হয়েছে যে,

عن أبي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلا قال عِنْدَ الْجَمْرَةِ يا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قال: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ .

আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, জামারার নিকট এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন: সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা।[৫০]

আল্লাহর পথের এই জিহাদই মু'মিনের আখিরাতে নাজাত ও সফলতা প্রাপ্তির সোপান। কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর পথে জিহাদকারী হয় তখনই তার পক্ষে যাবতীয় প্রতিকূলতা মাড়িয়ে ইসলামের সকল বিধান অনুসরণ করে চলা সম্ভব হয়। তাই একজন মু'মিনের জীবনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্ব অপরিসীম।

সুতরাং আরবীতে জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পরিশ্রম করা, মেহনত করা, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। আর পারিভাষিক অর্থে জিহাদ হলো- "সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং তার সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা, এ পথে সব রকমের কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহকে যেসব দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক শক্তি দান করা হয়েছে তা এই হকের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে নিয়োজিত করা এবং শেষ পর্যন্ত যদি বিরোধী পক্ষের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষ করতে হয় তাহলে সেজন্যেও প্রস্তুত থাকা।"

হাদীসের শিক্ষা:

- মৌলিক 'ইবাদাতসমূহের মধ্যে সালাতই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- সালাত সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি নেক আমল।
- আল্লাহর দীনের প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের যাবতীয় চেষ্টাকেই জিহাদ বলে।

---

৫০. আল-মু'জামুল কাবীর, খ. ৮, পৃ. ২৮২, হাদীস নং- ৮০৮১

www.pathagar.com

- কিতাল ফী সাবীলিল্লাহও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর একটি পর্যায়।
- সালাত যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে।
- মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সুষ্ঠু সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার অন্যতম সোপান।
- মাতা-পিতার প্রতি আচরণের মাধ্যমেই সন্তানের জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নিশ্চিত হয়।
- মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করলে আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং রিযক বাড়ে।
- মাতা-পিতার প্রতি অবাধ্য সন্তানের নেক আমল মহান আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না।
- অন্যের বাবা-মা'র প্রতি দূর্ব্যবহার করলে প্রকারান্তরে নিজের বাবা-মা'র প্রতিও দূর্ব্যবহার করা হয়।
- মাতা-পিতারও উচিত নয় অন্যায়ভাবে সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের দাবী অনুযায়ী সময়মত সালাত আদায় এবং মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের মধ্য দিয়ে সর্বদা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা দান করুন। আর এর ওসীলায় পরকালে আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৫

সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গ

عن أبي مُوسَى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ منه وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ منه رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً .

সরল অনুবাদঃ

আবূ মূসা (আল আশ'আরী) (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে আতরওয়ালা এবং কামারশালার মত। আতরওয়ালা হয়ত বা তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তুমি তার থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা তার থেকে তোমার সুগন্ধি মিলবে। অন্যদিকে কামারের ভাট্টি (কামারশালা) হয়ত বা তোমার কাপড়কে জ্বালিয়ে দিবে অথবা সেখান থেকে তুমি দুর্গন্ধ পাবে।[৫১]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

মূল নাম 'আব্দুল্লাহ, পিতার নাম কাইস আর উপনাম আবূ মূসা। উপনামেই তিনি বেশি খ্যাত ছিলেন। আশ'আর গোত্রের অধিবাসী ছিলেন বলে তাকে 'আল-আশ'আরী' বলা হত।

ইসলামের প্রতি অতিশয় আস্থাশীল হয়ে তিনি ইয়ামান থেকে মাক্কায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। মাক্কায় এসে তিনি বানু 'আব্‌দি শামস গোত্রের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ইসলাম গ্রহণ করে কিছুদিন সেখানে থাকার পর তিনি আবার নিজ এলাকায় ফিরে আসেন।

নিজ এলাকায় এসে তিনি ব্যাপকভাবে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে থাকেন। তিনি এলাকার প্রভাবশালী নেতা ছিলেন বিধায় লোকেরা খুব দ্রুত তার দা'ওয়াতে সাড়া

---

৫১. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২১০৪, হাদীস নং- ৫২১৪

www.pathagar.com

দিতে থাকে। এরপর পঞ্চাশ জন সাহাবী সহ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে হাবশায় গিয়ে জা'ফার ইবনু আবী তালিব ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। এরপর উভয় দল একসঙ্গে মাদীনায় রওয়ানা হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সময় খাইবার বিজয় শেষে মাদীনায় এসে পৌঁছান। ফলে আবূ মূসা ও সঙ্গীরা খাইবারের গাণীমাতের অংশও পান। মাক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাথে শরীক হন।

আবূ মূসা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে ও সরল প্রকৃতির। 'দুমাতুল জান্দাল' এ তিনি 'আলী (রা.) এর পক্ষের বিচারক ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। 'আলী (রা.) বলেন- 'মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবূ মূসা 'ইলমের রঙ্গে রঙ্গিন'। কোরআন তিলাওয়াত ও শিক্ষাদান ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। তাঁর তিলাওয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খুবই পছন্দ ছিল। তিনি বলতেন: 'আবূ মূসা দাউদের লাহানের কিছু অংশ লাভ করেছে'। 'আল্লামা শা'বী বলেন: ছয় জনের নিকট থেকে 'ইলম গ্রহণ করা হয়। তাঁরা ছয় জন হলেন- 'উমার, 'আলী, উবাই, ইবনু মাস'উদ, যায়িদ ও আবূ মূসা (রা.)'।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর জীবদ্দশায় এবং পরে তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। 'উমার (রা.) এর সময় তাঁর হাতেই 'আহওয়ায' বিজিত হয়। হাদীসের খিদমাতেও তার অনন্য অবদান ছিল। কূফায় তিনি স্বত:স্ফুর্তভাবে হাদীসের দারস দিতেন। সে দারসের মাধ্যমে বড় বড় মুহাদ্দিস সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৬০ টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ৫০টি। ৫০ হিজরী, মতান্তরে ৫২ হিজরী সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে সৎ সঙ্গ ও অসৎ সঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সৎ সঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ও এর উপকারীতা তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে অসৎ সঙ্গের ক্ষতি ও এর মারাত্মক পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা মানুষের জীবনে সৎ কিংবা অসৎ সঙ্গের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৎ সঙ্গীর সাহচর্যে থেকে একজন মানুষের জীবনে যেমন বিরাট ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। আবার অসৎ সাহচর্যের কারণে ভাল মানুষের জীবনেও বিরাট নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এক আরবী কবি তাই বলেছিলেন:

عَنِ الْمَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَ سَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ ، وَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ مُهْتَدِيْ .

www.pathagar.com

ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, জিজ্ঞেস করো তার সাথী সম্পর্কে। কেননা প্রত্যেক সাথীই তার সাথীদের রঙে রঙিন হয়।[৫২] অর্থাৎ সঙ্গ ভাল হলে ব্যক্তি ভাল হবেই। আর সঙ্গ ভাল না হলে তার সাথের ব্যক্তি ভাল না হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষাতেও তাই একটি প্রবাদে এভাবে বলা হয়- 'সৎ সঙ্গে জান্নাতবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। সাথী ও সঙ্গীদের সততা ও অসততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই ইসলামে সফরসঙ্গী ও প্রতিবেশী নির্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عن سَعِيدِ بن رَافِعِ بن خَدِيجٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اِلْتَمِسُوا الْجَارَ قَبْلَ الدَّارِ وَالرَّفِيقَ قَبْلَ الطَّرِيقِ .

সা'ঈদ ইবনু রাফি' ইবনু খাদীজ তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: বসত গড়ার আগে তোমরা (উত্তম) প্রতিবেশী খোঁজে নাও। আর সফর করার আগে (উত্তম) সাথী/সফরসঙ্গী খোঁজে নাও।[৫৩]

কেননা প্রতিবেশী ভাল না হলে তার পাশে বসত করে স্বস্তিতে থাকা যায় না। সফরসঙ্গী ভাল না হলে তার সাথে সফর করে নির্বিঘ্নে চলা যায় না এবং মানসিক প্রশান্তি মিলে না। সময়ে অসময়ে তার দ্বারা নিগ্রহের শিকার হতে হয়। তার অসততার কারণে কখনো বা বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হওয়া লাগে। তাই একদিকে নিজের জানমালের নিরাপত্তা এবং অপরদিকে শান্তিপূর্ণ সামাজিক সহাবস্থানের লক্ষ্যেই আমাদের সৎ সঙ্গ বাছাই করার ব্যাপারে সজাগ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৎ সঙ্গী নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সৎ সঙ্গী কোন না কোনভাবে তার সঙ্গীর উপকার করে। অথবা না চাইলেও তার থেকে কিছু উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু অসৎ সঙ্গী কোন উপকারতো করেই না, বরং না চাইলেও তার দ্বারা কিছু অপকার বা ক্ষতি হয়েই যায়। আর একথা বুঝাতে গিয়ে তিনি সৎ সঙ্গী আর অসৎ সঙ্গীকে দুই পেশার দুইজন ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। সৎ সঙ্গীকে তিনি তুলনা করেছেন আতরবিক্রেতার সাথে। আতরবিক্রেতার স্বভাবই হচ্ছে যে, সে প্রথমেই তার গচ্ছিত আতর থেকে আশপাশের সকলকে একটু করে লাগিয়ে

---

৫২. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৫, পৃ. ২৩৫

৫৩. আলমু'জামুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৬৮, হাদীস নং- ৪৩৭৯

www.pathagar.com

দেবে। এরপর যারা চাইবে তার থেকে তা কিনে নিবে। তবে কেউ যদি তার থেকে কিনে নাও নেয় সে এমনিতেই আতরের সুগন্ধি পেয়ে গেল। আর অসৎ সঙ্গীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনা করেছেন কামারের সাথে। যে কামারশালায় কাজ করে তার কাছে কেউ গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার গায়ে আগুনের ফুলকী গিয়ে পড়তে পারে। তার দেহ আগুনে ঝলসে যেতে পারে অথবা তার জামা আগুন দিয়ে জ্বলে যেতে পারে অথবা সে সেখান থেকে দুর্গন্ধ পেতে পারে। মোটকথা কোনভাবেই তার এ ধরনের সঙ্গী দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বর্ণনাকারী আবূ মূসা (রা.) তাই বলেন:

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ أَصَابَكَ مِنْ رِيْحِهِ ، وَمَثَلُ الْجَلِيْسِ السُّوْءِ مَثَلُ الْقَيْنِ ، إِنْ لَمْ يُحْرِقْكَ بِشَرَرِهِ عَلِقَ بِكَ مِنْ رِيْحِهِ .

উত্তম সাথীর দৃষ্টান্ত হলো আতরবিক্রেতার মত, সে যদি তোমাকে আতর নাও লাগায় তুমি এর সুগন্ধি পেয়ে যাবে। আর মন্দ সাথীর দৃষ্টান্ত হলো কামারের মত, তার আগুনের ফুলকী যদি তোমাকে নাও পোড়ায়, এর দুর্গন্ধ তুমি পেয়েই যাবে।[৫৪]

আর তাই একজন মু'মিনের উচিত নিজের সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। জীবন চলার পথে এমন সঙ্গী বাছাই করা যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ আশা করা যায় এবং কোন প্রকার অকল্যাণের আশংকা নেই।

উত্তম বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব:

সৎ সঙ্গী বা উত্তম বন্ধু নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্ব এদিক থেকে যে, মানুষ সাধারণত তার সাথী-সঙ্গীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। যে যার সাথে বেশি সখ্যতা রাখে তার আচার-আচরণের প্রতিচ্ছবি তার মাঝে পাওয়া যায়। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর স্বভাব-চরিত্রেই চরিত্রবান হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন খেয়াল রাখে যে সে কার সাথে বন্ধুত্ব রাখছে।[৫৫]

---

৫৪. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৯, পৃ. ১১, হাদীস নং- ২৪৭৩৭

৫৫. আল-মুসতাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং- ৭৩১৯

www.pathagar.com

কেবল ইহলৌকিক দিক থেকেই নয়, বরং পারলৌকিক দিক থেকেও বন্ধুত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মানুষ যাকে ভালবাসে, যার সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক থাকে, তার সাথেই পরকালে তার হাশর হবে। তাদের মতই তার পরকালীন পরিণতি হবে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, সঙ্গী দুই প্রকার- উত্তম/ভাল সঙ্গী এবং অধম/মন্দ সঙ্গী। উত্তম সঙ্গী আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিবে যাতে আমাদের দীন ও দুনিয়ার উপকার হবে। আল্লাহর আনুগত্য, উত্তম চরিত্র, সুন্দর কথা, কাজ ও ব্যবহারের দিকে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। অন্যদিকে অধম কিংবা মন্দ সঙ্গী তার সাথীর জন্য বিপদজনক। সে তাকে ধ্বংস এবং প্রবৃত্তির দিকে প্ররোচিত করে। তাই এই বন্ধুত্ব যদি আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে না হয় তাহলে তারা কিয়ামাতের দিবসে পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে। কাজেই ভাল সঙ্গী তালাশ করা এবং মন্দ সঙ্গী হতে দূরে থাকা প্রত্যেক মু'মিনের নৈতিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

(الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)

"ঐ দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া আর সব বন্ধু-বান্ধবই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে"।[৫৬] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا عَلَى أَعْمَالِهِمْ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ زُمْرَتِهِمْ فَحُوْسِبَ بِحِسَابِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ أَعْمَالَهُمْ .

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কর্মকে পছন্দ করল কিয়ামাতের দিন সে তাদের দলভূক্ত হয়েই হাশরে উত্থিত হবে। এবং সেও তাদের কর্মকান্ডের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে যদিও সে নিজে তা করেনি।[৫৭] অপর বর্ণনায় এসেছে:

إِنَّ اللهَ يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَغْفِرَ لِقَوْمٍ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَعَهُمْ .

আল্লাহ তা'আলা ঐ কাওমকে ক্ষমা করতে লজ্জাবোধ করেন যাদের মধ্যে এমন (অসৎ/পাপাচারী) ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের দলভূক্ত নয়, তবে পরে তিনি তাকেও তাদের সাথে ক্ষমা করে দেন।[৫৮]

---

৫৬. আলকোরআন: সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৬৭

৫৭. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৯, পৃ. ১১, হাদীস নং- ২৪৭৩০

৫৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৪৭৩৩

www.pathagar.com

উপরোক্ত প্রথম বর্ণনায় অসৎ সঙ্গের নেতিবাচক ফল আর দ্বিতীয় বর্ণনায় সৎ সঙ্গের ইতিবাচক ফল প্রমাণিত হল। সুতরাং মু'মিনের জীবনে বন্ধু নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাথমিক অবস্থায় নিজের অজান্তে এ নির্বাচনে ভুল হয়েও যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে জেনে শুনে এই ভুলের উপর চলতে থাকা উচিত নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ভুলকে শুধরে ফেলতে হবে। কেননা একজন মু'মিন কখনো একই গর্তে দুইবার পা দেয় না। সঙ্গী নির্বাচনে একবার যদি তার ভুল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে অতিসত্বর তা শুধরে ফেলবে এবং পূণরায় এ ভুল করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: একজন মু'মিন কখনো একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।[৫৯]

সুতরাং নিজের সাথী ভাল নয় এটা বুঝে ফেলার পর মু'মিন কোন অবস্থাতেই তার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখবে না। তার উপর প্রভাব খাটিয়ে নিজে তাকে সংশোধিত করার সুযোগ থাকলে তা করবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যেন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজে নষ্ট হয়ে না যায় এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতনতার সাথে অগ্রসর হবে। তবে খারাপ সাথীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশংকায় সকল মানুষের সাথেই মেলামেশা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। কেননা মু'মিন জীবনের অন্যতম দর্শন হচ্ছে- যা সে নিজের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর জেনেছে তার দিকে অপরকে আহবান করা এবং এ পথে প্রয়োজনীয় ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

اَلْمُسْلِمُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُعَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِيْ لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ.

যে মুসলিম মানুষের সাথে মিশে এবং মিশতে গিয়ে কষ্টের শিকার হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করে সে ঐ মুসলিমের চেয়ে উত্তম যে মানুষের সাথে মিশেও না এবং এ পথে কষ্টের শিকার হয়ে ধৈর্য্যও ধারণ করে না।[৬০]

---

৫৯. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২২৭১, হাদীস নং- ৫৭৮২ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২২৯৫, হাদীস নং- ২৯৯৮

৬০. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৯, পৃ. ১১, হাদীস নং- ২৪৭৩৮ (জামি' আত-তিরমিযী, হাদীস নং- ২৫০৭)

www.pathagar.com

জীবন চলার পথে তাই সদা নেক বন্ধু খোঁজে বেড়াতে হবে। তাতে নিজেরও যেমন কল্যাণ হবে, তারও তেমনি কল্যাণ করা যাবে। তবে ভাল বন্ধু না পাওয়া গেলে জেনে শুনে খারাপ বন্ধুর সাথে থাকার চেয়ে একাকী থাকাই উত্তম। যেমন আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

اَلْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ .

নেক বন্ধুর সাহচর্যে থাকা একাকী থাকার চেয়ে ভাল। তবে (নেক বন্ধু না পেলে) খারাপ বন্ধুর সাহচর্যে থাকার চেয়ে বরং একাকী থাকাই ভাল।[৬১] অতএব দীনের পথে অটল অবিচল থাকার জন্য সদা নেক বন্ধুর সাহচর্য খুজতে হবে। যে বন্ধু হবে কল্যাণের পথে আহবানকারী, ভাল কাজে সহযোগিতাকারী এবং অন্যায় কাজে বাধা দানকারী।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সৎ সঙ্গী লাভ করতে পারা মহান আল্লাহর এক বিশেষ নি'আমাত। আর অসৎ সঙ্গীর খপ্পরে পড়া মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি তূল্য।
২. সৎ সঙ্গী থেকে কোন না কোনভাবে উপকার আশা করা যায়। আর অসৎ সঙ্গী থেকে কোনভাবেই উপকার আশা করা যায় না।
৩. সৎ সঙ্গী থেকে নিজে না চাইলেও উপকৃত হওয়া যায়। আর অসৎ সঙ্গী থেকে নিজে চাইলেও উপকৃত হওয়া যায় না।
৪. সঙ্গী সৎ হলে কোন না কোনভাবে উপকার মিলবেই । আর সঙ্গী অসৎ হলে কোনভাবেই তার অনিষ্টতা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়।
৫. উত্তম সঙ্গী তালাশ করা এবং মন্দ সঙ্গী হতে দূরে থাকার চেষ্টা করা উচিত।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৎ সঙ্গী নির্বাচন করে তাদের সাথে পথ চলার এবং পরকালে তাদের ন্যায় সফল হওয়ার তাওফীক দিন। আর অসৎ সঙ্গীর ব্যাপারে সাবধান থাকার এবং তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলার তাওফীক দিন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

৬১. মূসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৭, পৃ. ১৪২, হাদীস নং- ৩৪৮১৯, ৩৪৮২০ ও ৩৪৮২১

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৬

রামাদানুল মুবারাকের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا. مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيْهِ فَرِيْضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئٌ. قَالُوْا: لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ، فَقَالَ: يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ شُرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مُذْقَةِ لَبَنٍ. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. وَاسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لاَ غِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَتَسْتَغْفِرُوْنَهُ. وَأَمَّا اللَّتَانِ لاَغِنًى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُوْنَ اللهَ الْجَنَّةَ وَ تَعُوْذُوْنَ بِهِ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ أَشْبَعَ فِيْهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِيْ شُرْبَةً لاَ يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ .

www.pathagar.com

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ শা'বান মাসের শেষ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেনঃ হে লোক সকল! একটি মহান মাস তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করেছে। বরকতময় মাস। এ মাসটিতে একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। মহান আল্লাহ এ মাসের সিয়াম পালনকে ফারয করেছেন আর এর রাতগুলোতে সালাত আদায় করাকে নাফল করেছেন। এ মাসে কেউ কোন ভাল কাজ (নাফল) করলে সে অন্য মাসের ফারযের সমান সাওয়াব পাবে। আর এ মাসে কোন ফারয আদায় করলে অন্য মাসের সত্তরটি ফারযের সমান সাওয়াব পাবে। এটি ধৈর্য্যের মাস। আর ধৈর্য্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটি সহমর্মিতার মাস। এটি এমন মাস যে মাসে মু'মিনের রিযক বাড়িয়ে দেয়া হয়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং ঐ রোযাদারের প্রতিদান ঠিক রেখে তাকেও তার সমপরিমাণ প্রতিদান দেয়া হবে। সাহাবীরা বললেনঃ রোযাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ আমাদের সকলের নাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি রোযাদারকে একটি খেজুর, একটু পানি কিংবা একটু দুধ দিয়ে ইফতার করাবে তাকেও মহান আল্লাহ এই প্রতিদান দেবেন। এটি এমন মাস যে মাসের প্রথমাংশ রাহমাত, মাঝের অংশ মাগফিরাত এবং শেষাংশ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ। (এ মাসে) যে ব্যক্তি তার অধীনস্থের বোঝা কমিয়ে দেবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। এ মাসে তোমরা চারটি কাজ বেশি বেশি করে করবে। দু'টো কাজ এমন যা দিয়ে তোমরা তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করবে। আর দু'টো এমন যা ছাড়া তোমাদের কোন উপায়ই নেই। যে দু'টো দিয়ে তোমরা তোমাদের রবকে সন্তুষ্ট করবে সেগুলো হলো- এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন (সত্যিকার) ইলাহ নেই এবং তাঁর কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যে দু'টো ছাড়া তোমাদের কোন উপায়ই নেই তা হলো- তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করবে এবং তাঁর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে রোযাদারকে পরিতুষ্ট করে খাওয়াবে আল্লাহ তাকে আমার হাউয থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যে, জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না।[৬২]

---

৬২. সাহীহ ইবন খুযাইমাহ, খ. ৩, পৃ. ১৯১, হাদীস নং- ১৮৮৭

www.pathagar.com

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

সালমান (রা.) পারস্য অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। সাহাবীদের মাঝে তিনি সালমান আল-ফারেসী নামে খ্যাত ছিলেন। অনারব হওয়া সত্ত্বেও সাহাবীদের মাঝে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক বেশি। তিনি খুবই বিচক্ষণ ও একনিষ্ঠ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে অনেক যাচাই বাছাই করে ইসলামের সত্যতা জেনে বুঝে তিনি ঈমান আনয়ন করেন।

আহযাবের যুদ্ধের আগে কাফিরদের মাদীনা আক্রমণের সংবাদে বিচলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, তখন তিনিই তাঁকে পরিখা/ খন্দক খনন করে মাদীনা শহরকে রক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই বিচক্ষণতা দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। সত্যি সত্যি তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী খন্দক খননের মাধ্যমে মাদীনা শহরকে কাফিরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছিল। আর এ কারণেই এই যুদ্ধের নাম হয়েছিল খন্দকের যুদ্ধ। খালীফাহ 'উমার (রা.) তাঁর শাসনামলে সালমানকে (রা.) মাদায়িন নগরীর গভর্ণরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি ৩৫ হিজরী মোতাবেক ৬৫৫ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

আলোচ্য হাদীসে রামাদানুল মুবারাকের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর জন্য এ মাসটি এক মহা নি'আমাত। এতে রয়েছে এমন এক মহিমান্বিত রাত যে রাত একাই হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসের সকল 'ইবাদাতকে অন্য মাসের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছে। এ মাসের নাফল অন্য মাসের ফারযের মত। এ মাসের একটি ফারয অন্য মাসের সত্তরটি ফারযের মত.. ইত্যাদি। অন্য যে কোন মাসের তুলনায় তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসকে অধিক গুরুত্বের সাথে উদযাপন করতেন। বর্ণিত হয়েছে যে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِيْ رَمَضَانَ مَا لاَيَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ ، وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ .

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নাফল 'ইবাদাতের ব্যাপারে) এত বেশি চেষ্টা করতেন যা

www.pathagar.com

অন্য কোন মাসে করতেন না। আর এ মাসের শেষ দশকে তিনি এত বেশি চেষ্টা করতেন যা অন্য অংশে করতেন না।[৬৩]

রামাদান মাসের এহেন গুরুত্বের কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসটি আসার দু'মাস আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করতেন। আর মহান আল্লাহর কাছে এ মাস পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য আবেদন করে বলতেন:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজাব মাস আসলে বলতেন: হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে রাজাব এবং শা'বান মাসে বরকত দিন এবং আমাদেরকে রামাদান পর্যন্ত পৌঁছান।[৬৪]

অর্থাৎ রামাদান মাসের অশেষ নি'আমাত থেকে যেন বঞ্চিত না থাকতে হয় সেজন্যে তিনি ঐ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন এবং এ মাসের সকল কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুই মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকতেন। সে কারণেই এ দুই মাসে আল্লাহর কাছে বরকত কামনা করতেন। অতএব মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনে আলোচ্য হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

শা'বানের শেষ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে, যেই গুরুত্বপূর্ণ মাসটির অপেক্ষায় আমরা এতদিন ছিলাম সেটি আমাদের দুয়ারে এসে গেছে। তাই এখন আঁট সাঁট বেঁধে এ মাসের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে যথাযথ ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করতে হবে। এটি বরকতের মাস, তাই এর থেকে যথাযথ বরকত হাসিল করতে হবে। এ মাসে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম একটি রাত্রি আছে। এ রাত্রিটি যেন কেউ হেলায় না কাটিয়ে দেয়। শেষ দশকের যে কোন বেজোড় রাতে এটি হতে পারে। তাই শেষ দশক ই'তিকাফের মাধ্যমে মাসজিদে কাটিয়ে কিংবা ই'তিকাফ ছাড়াই সজাগ সচেতন থাকার মাধ্যমে

---

৬৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৮৬

৬৪. মুসনাদ আহমাদ, খ. ১, পৃ. ২৫৯, হাদীস নং- ২৩৪৬

www.pathagar.com

এ রাতটিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাবার চেষ্টা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত্রি অন্বেষণ কর।[৬৫]

এ মাসের সিয়াম পালন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মু'মিন নর নারীর উপর ফারয করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

রামাদান ঐ মাস, যাতে আলকোরআন নাযিল করা হয়েছে। যা মানবতার জন্য হিদায়াত। যা এমন স্পষ্ট উপদেশে পূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। তাই যে ব্যক্তি এ মাস পায় তার অবশ্য কর্তব্য যে, সে যেন পুরো মাস রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য সময় ঐ দিনগুলোর রোযা করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তা তিনি চান না। তোমাদেরকে এ জন্যই এ নিয়ম দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পুরা করতে পারো, আর যে হিদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন এর জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করতে পারো এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারো।[৬৬]

অতএব অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে এ মাসে কেউ সিয়াম পালন করতে না পারলে তাকে তা পরবর্তীতে আদায় করে নিতে হবে। আর এ মাসের রাত্রিতে এক বিশেষ নাফল সালাতের বিধান দেয়া হয়েছে যা 'সালাতুত তারাবীহ' নামে

---

৬৫. সাহীহুল বুখারী, খ. ৪, পৃ. ২২৫

৬৬. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:১৮৫

www.pathagar.com

খ্যাত, ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে তা পালন করলে অতীতের গুনাহরাজী ক্ষমা করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রামাদান মাসে কিয়াম (দাঁড়িয়ে সালাত আদায়) করল, তার অতীতের গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেয়া হলো।[৬৭] আরেক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে কদরের রাত্রিতে কিয়ামুল লাইল করবে, তার অতীতের গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৬৮] মূলত: এই মহিমান্বিত রাত্রিকে অন্বেষনের লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং উম্মাতের জন্যও তিনি এই নির্দেশনা রেখে গেছেন।

এ মাসের বরকতের এটিও একটি দিক যে, এতে কোন ফারয আদায় করলে অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফারযের সমান বদলা পাওয়া যায়। আর এ মাসে কোন নাফল করলে অন্য মাসের ফারযের ন্যায় সাওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছ থেকে অধিক প্রতিদান পাওয়া এবং তাঁর নৈকট্য লাভের এটি এক বিশেষ মৌসুম। এ মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে ধৈর্য্যের বাস্তব প্রশিক্ষণ মিলে। পানাহার এবং অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীগুলো মানুষকে সাধারণত জান্নাতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তারা বাধ্যতামূলকভাবে এসব পরিহার করে নিজেদেরকে জান্নাতের পথে ধাবমান করে। আর সম্ভবত এ কারণেই হাদীসে ধৈর্য্যের প্রতিদান বলা হয়েছে জান্নাত।

রামাদান সহমর্মিতার মাস। এ মাসে ধনীরা গরীবদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের প্রকাশ্য সুযোগ লাভ করে। সিয়াম সাধনা করতে গিয়ে তারা হারে হারে টের পায় যে, সারা বছর একজন গরীব কিভাবে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায়। এই বাস্তব উপলব্ধি থেকেই সে তখন তার গরীব ভাইটিকে কাছে টেনে নেয়। নিজের সাথে তাকে ইফতার খাওয়ায়। তারই পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ নাফল নামায আদায় করে। নিজের ভাল খাবারে তাকে শেয়ার করায়। আর মহান আল্লাহ তাই

---

৬৭. সাহীহুল বুখারী, খ. ৪, পৃ. ২১৭, ২১৮ ও সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৮৬
৬৮. সাহীহুল বুখারী, খ. ৪, পৃ. ২২১

www.pathagar.com

খুশী হয়ে তাদের সকলেরই রিযক বাড়িয়ে দেন। (এ মাসে) সহমর্মিতা প্রকাশ করে যে ব্যক্তি তার অধীনস্তের বোঝা কমিয়ে দেবে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।

এ মাসে কোন রোযাদারকে ইফতার করালে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় এবং ঐ রোযাদারের ন্যায় সমান প্রতিদান তার আমলনামায়ও লেখা হয়। ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী এই ইফতারের মান এবং পরিমাণ যাই হোক না কেন। অর্থাৎ অপর ভাইকে ইফতার করিয়ে এই মর্যাদা লাভের সুযোগ ধনী গরীব সকলের জন্যই অবারিত।

মহিমান্বিত এ মাসটিকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম দশক রহমতের। এ দশকে মহান আল্লাহর অবারিত রহমত বইতে থাকে। মাঝের দশকে থাকে বান্দাদের জন্য মাগফিরাত ও ক্ষমা। আর শেষ দশকে থাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির অপার ঘোষণা। অর্থাৎ মহান আল্লাহর অপার মহিমা পুরো মাস ব্যাপী থাকে বহমান। প্রথম দশকে মহামহিমের রহমতের ছুঁয়া পেয়ে দ্বিতীয় দশকে বান্দারা তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করে এবং অবশেষে তাঁরই করুণায় জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা পেয়ে ধন্য হয়। এভাবে রামাদান একজন মু'মিনের জীবনে কল্যাণ, ক্ষমা ও নাজাতের দিশা নিয়ে আগমন করে।

এ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি কাজ বেশি বেশি করে করতে বলেছেন। যার মধ্যে দু'টো কাজ এমন যা দিয়ে বান্দাহ তার রবকে সন্তুষ্ট করবে। আর দু'টো এমন যা ছাড়া তার কোন উপায়ই নেই। যে দু'টো দিয়ে তারা তাদের রবকে সন্তুষ্ট করবে সেগুলো হলো- মহান আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিবে এবং তাঁর কাছে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যে দু'টো ছাড়া তাদের কোন উপায়ই নেই তা হলো- তারা আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করবে এবং তাঁর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে। আর এ কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না যে, প্রথম দু'টি নিশ্চিত করতে পারলেই পরের দু'টিও নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাবে।

এ মাসের আরেকটি মহান ফযীলত এই যে, যে ব্যক্তি এ মাসে রোযাদারকে পরিতুষ্ট করে খাওয়াবে আল্লাহ তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাউয থেকে এমন পানীয় পান করাবেন যে, জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রামাদানের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে এর থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করার তাওফীক দান করুন।

www.pathagar.com

হাদীসের শিক্ষা:

১. রামাদানুল মুবারাক বছরের সেরা মাস। এ মাসে সিয়াম ও কিয়াম পালনের মাধ্যমে একজন মু'মিন তাঁর ইহলৌকিক কল্যাণ, ক্ষমা ও পারলৌকিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে।

২. রামাদানুল মুবারাক ধৈর্য্য ও সহমর্মিতার মাস। এ মাসে ক্ষুত-পিপাসা ও বিশ্রাম ইত্যাদিতে ধৈর্য্যের প্রশিক্ষণ নিয়ে মু'মিনরা সামাজিক শান্তি ও শৃংখলার বিপ্লব ঘটাতে পারে। ধনী ও গরীবের ব্যবধান গুচিয়ে তারা সমাজে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের নজীর স্থাপন করতে পারে।

৩. রামাদানুল মুবারাক মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অপার সুযোগ। রাহমাত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের সুযোগ পুরো মাস ব্যাপী অবারিত থাকে।

৪. রামাদানুল মুবারাক অল্প পরিশ্রমে অধিক লাভের এক অনন্য ব্যবস্থা। এ মাসে লাইলাতুল কাদর রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

৫. রামাদানুল মুবারাক গরীব ধনী সকলের জন্যই এক মহা নি'আমাত। এ মাসে সকলেই অল্প পরিশ্রম করে কিংবা অতি অল্প বিনিয়োগ করে অনেক বেশি লাভবান হতে পারে।

৬. রামাদানুল মুবারাক দয়া প্রদর্শনের মাস। এ মাসে নিজের অধীনস্থদের প্রতি দয়াবান হয়ে তাদের বোঝা হালকা করে দেয়ার মাধ্যমে সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

৭. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম উপায় হলো তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া এবং তাঁর কাছে নতশির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৮. মু'মিন বান্দাদের উচিত মহান আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফিক দান করুন। তাঁর অফুরন্ত নি'আমাত দিয়ে আমাদেরকে সিক্ত করুন। তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ক্ষমা নসীব করুন। পরকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর অপার করুণায় জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৭

রাসূলের প্রতি দরুদ পাঠ ও মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: آمِيْنَ، آمِيْنَ، آمِيْنَ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ حِيْنَ صَعَدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ آمِيْنَ آمِيْنَ آمِيْنَ. قَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ فَقَالَ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِيْنَ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ . وَمَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبِرَّهُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِيْنَ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ. وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ قُلْ آمِيْنَ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মিম্বারে আরোহন করে বললেনঃ "আমীন, আমীন, আমীন"। তাঁকে বলা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন মিম্বারে আরোহন করেছিলেন তখন বলেছিলেন- আমীন, আমীন, আমীন। (আপনার এরূপ বলার হেতু কি?) তখন তিনি বললেনঃ আমার কাছে জিবরীল এসে বলেছিল, "যে ব্যক্তি রামাদান মাস পেল, কিন্তু সে ক্ষমা প্রাপ্ত হলো না। বরং জাহান্নামে যাবার উপযুক্ত হলো এবং আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করলেন। আপনি বলুনঃ আমীন"। আমি তখন বললামঃ আমীন। "আর যে ব্যক্তি পিতা-মাতা দু'জনকেই অথবা তাদের কোন একজনকে পেল, অথচ তাদের সাথে সদাচরণ করলো না। তাই মৃত্যুর পর সে জাহান্নামী হলো এবং আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করলেন। আপনি বলুনঃ আমীন"। আমি তখন বললামঃ আমীন। "আর যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করলো না। তাই মৃত্যুর পর সে

www.pathagar.com

জাহান্নামী হলো এবং আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করলেন। আপনি বলুন: আমীন" । আমি তখন বললাম: আমীন।[৬৯]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর।

আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার

---

৬৯. সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ৩, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং- ৯০৭

www.pathagar.com

(রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে রামাদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। রামাদানের গুরুত্ব ও মর্যাদা, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবেসে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। এর উপর ব্যক্তির জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ভরশীল। এ তিনটি বিষয়ে অবহেলা করলে মহান আল্লাহর ক্রোধের শিকার হতে হয় এবং জাহান্নামে পতিত হওয়া অবধারিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ قد جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ تُفْتَحُ فيه أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فيه الشَّيَاطِينُ فيه لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من أَلْفِ شَهْرٍ من حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীদেরকে সুসংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের নিকট বরকতময় মাস রামাদান চলে এসেছে। এ মাসে সিয়াম সাধনা করা তোমাদের উপর ফারয করা হয়েছে। এতে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে শাইতানদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয়। এতে রয়েছে কাদরের রাত্রি, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে আসলেই বঞ্চিত হলো।[৭০]

عَنْ عبد الرحمن بن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أبيه رضي الله عنه قال قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ألا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ قال: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ

---

৭০. মূসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ২, পৃ. ২৭০, হাদীস নং- ৮৮৬৭

www.pathagar.com

وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وكان مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فقال: ألا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ألا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حتى قلتُ لَا يَسْكُتُ .

'আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাকরাহ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহের কথা বলবো না? আমরা বললাম: অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন: সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। (রাবী বলেন) তখন তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। অত:পর সোজা হয়ে বসে বললেন: সাবধান, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া । সাবধান, মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (রাবী বলেন) তিনি একথাটা বলতেই থাকলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, তিনি বোধ হয় আর থামবেন না।[৭১]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অবধারিত, যার নিকট আমার কথা উল্লেখ করা হলেও সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।[৭২]

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের এহেন গুরুত্বের কারণে এ ব্যাপারে আমাদের খুবই সাবধান হতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর অভিসম্পাত থেকে বেঁচে জাহান্নাম থেকে মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। একজন সফলকাম মু'মিনের জীবনে তাই হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

আলোচ্য হাদীসে প্রথমত: রামাদানুল মুবারাকের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর জন্য এ মাসটি এক মহা নি'আমাত। এতে রয়েছে এমন এক মহিমান্বিত রাত যে রাত একাই হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ

---

৭১. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২২২৯, হাদীস নং- ৫৬৩১

৭২. আল মুসতাদরাক 'আলা আস সাহীহাইন, খ. ১, পৃ. ৭৩৪, হাদীস নং- ২০১৬

www.pathagar.com

মাসের সকল 'ইবাদাতকে অন্য মাসের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছে। এ মাসের নাফল অন্য মাসের ফারযের মত। এ মাসের একটি ফারয অন্য মাসের সত্তরটি ফারযের মত.. ইত্যাদি। অন্য যে কোন মাসের তুলনায় তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মাসকে অধিক গুরুত্বের সাথে উদযাপন করতেন। বর্ণিত হয়েছে যে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِيْ رَمَضَانَ مَا لاَيَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ، وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ.

'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নাফল 'ইবাদাতের ব্যাপারে) এত বেশি চেষ্টা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর এ মাসের শেষ দশকে তিনি এত বেশি চেষ্টা করতেন যা অন্য অংশে করতেন না।[৭৩]

তাই এ মাসকে হেলায় কাটিয়ে দেয়া মারাত্মক বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন- যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে আসলেই বঞ্চিত হলো। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রামাদানের যথার্থ কল্যাণ নসীব করুন।

হাদীসটির দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ। আলকোরআনে মহান আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের পরেই মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কোন মানুষের প্রতি মহান আল্লাহর পরে তার মাতাপিতার অবদানই সবচেয়ে বেশি। আর মহান আল্লাহই তার প্রতি তাদেরকে অনুরাগী করেছেন। তাই তাদের প্রতি অযত্ন, অবহেলা কিংবা অসদাচরণ করলে মহান আল্লাহ অত্যন্ত নাখোশ হন। আলকোরআন ও আলহাদীসে তাই তাওহীদের পরেই মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের কথা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَاكَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً.

---

৭৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৮৬

www.pathagar.com

(হে নাবী!) আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কোন একজন বা দু'জনই যদি তোমাদের কাছে বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তোমরা তাদেরকে উহ্-ও বলবে না, তাদেরকে ধমক দিবে না এবং তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবে। নরম হয়ে এবং রহমের সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এই বলে তাদের জন্য দু'আ করতে থাকবে: হে আমার রব! তুমি তাঁদের দু'জনের উপর তেমনি রহম করো, তাঁরা যেমন আমাকে ছোট বয়সে আদর যত্ন করে লালন-পালন করেছেন।[৭৪] হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عبد اللّٰهِ بن عَمْرٍو رضي الله عنهما قال: جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رَسُولَ اللّٰهِ ما الْكَبَائِرُ قال الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ قال ثُمَّ مَاذَا قال ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قال ثُمَّ مَاذَا قال الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قلت وما الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قال الذي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هو فيها كَاذِبٌ .

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে এসে বললো- হে আল্লাহর রাসূল! কাবীরাহ গুনাহ কোন্গুলো? তিনি বললেন: কাবীরাহ গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানানো। লোকটি বললো: তারপর কোন্টি? তিনি বললেন: তারপর পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। লোকটি বললো: তারপর কোন্টি? তিনি বললেন: মিথ্যা শপথ করা। তখন আমি বললাম: মিথ্যা শপথ কি? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে কোন মুসলিমের সম্পদ হরণ করে নেয়।[৭৫] মহান আল্লাহ আমাদেরকে পিতামাতার প্রতি সদাচারী হয়ে তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচার এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার তাওফীক দান করুন।

হাদীসটির তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যথার্থ অনুসরণ। আর রাসূলকে অনুসরণের নমূনা হলো তাঁর আনীত আদর্শের যথাযথ অনুকরণ করা এবং বাস্তব জীবনে তাঁকে ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে যখনই তাঁর নাম উচ্চারিত হয় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা। রাসূলের নাম শুনে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ না করাকে হাদীসে বখীলি বা কৃপণতা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বর্ণনা নিম্নরূপ:

---

৭৪. আলকোরআন: সূরা আল ইসরা, ১৭:২৩-২৪

৭৫. সাহীহুল বুখারী, খ. ৬, পৃ. ২৫৩৫, হাদীস নং- ৬৫২২

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْبَخِيْلَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد عن أبي هريرة.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আলী ইবনু আল হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত বখীল যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলেও সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। (গ্রন্থকার হাকিম বলেন, এটি বিশুদ্ধ সনদের হাদীস। তবে বুখারী ও মুসলিম তাদের গ্রন্থে এটি আনেননি। আবূ হুরাইরাহ থেকেও এর স্বপক্ষে হাদীস রয়েছে)।[৭৬]

رَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ: إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى مَلاَئِكَةً خُلِقُوْا مِنَ النُّوْرِ لاَ يَهْبِطُوْنَ إِلاَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَيْدِيْهِمْ أَقْلاَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَدَوِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ وَقَرَاطِيْسَ مِنْ نُوْرٍ لاَ يَكْتُبُوْنَ إِلاَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ.

দাইলামী 'আলী (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহর একদল মালাইকা রয়েছেন যারা নূরের তৈরী। জুমু'আর রাত্রিতেই কেবল তারা অবতীর্ণ হন। জুমু'আর দিন সোনার কলম, রোপার দোয়াত ও নূরের কাগজ হাতে নিয়ে তারা কেবল নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপর দরূদ পাঠকারীদের ব্যাপারে লিখতে থাকেন।[৭৭]

رَوَى الدَّيْلَمِيُّ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَهُ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

দাইলামী 'আয়িশাহ (রা.) এর সূত্রে আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আমার উপর দরূদ পাঠ করে কিয়ামাতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত রয়েছে।[৭৮]

এমনিভাবে আলোচ্য হাদীসের তিনটি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়েই হাদীসের গ্রন্থসমূহে অনেক বর্ণনার সমাহার রয়েছে। যা বিষয় তিনটির অত্যধিক গুরুত্বের প্রমাণ বহন

---

৭৬. আল মুসতাদরাক 'আলা আস সাহীহাইন, খ. ১, পৃ. ৭৩৪, হাদীস নং- ২০১৫
৭৭. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১, পৃ. ২৫৫, হাদীস নং- ২২৩৮
৭৮. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১, পৃ. ২৫৫, হাদীস নং- ২২৩৯

www.pathagar.com

করে। কোন কোন বর্ণনায় রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِيْ هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ.

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: ঐ ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য যার কাছে আমার নাম নেয়া হলেও সে আমার উপর দরূদ পড়ে না। ঐ ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য যে তার পিতামাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল কিন্তু (তাদের সেবা করে) জান্নাতে যেতে পারল না। আর ঐ ব্যক্তির ধ্বংসও অনিবার্য যার কাছে রামাদান মাস এল কিন্তু সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই রামাদান চলে গেল।[৭৯]

এ কারণেই রামাদানের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে আমাদের যথাযথ ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা উচিত। আর পিতামাতার সাথে অসদাচরণের তো প্রশ্নই আসে না, বরং তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা উচিত। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর আদর্শের পূঙ্খানুপূঙ্খ অনুসরণ করা এবং যখনই তাঁর নাম উচ্চারিত হয় তখন শ্রদ্ধাভরে হৃদয়ের গভীর ভালবাসার সাথে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা উচিত।

হাদীসের শিক্ষা:

১. রামাদানুল মুবারাক বছরের সেরা মাস। এ মাসে সিয়াম ও কিয়াম পালনের মাধ্যমে একজন মু'মিন তাঁর ইহলৌকিক কল্যাণ, ক্ষমা ও পারলৌকিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে।

২. রামাদানুল মুবারাক অল্প পরিশ্রমে অধিক লাভের এক অনন্য ব্যবস্থা। এ মাসে লাইলাতুল কাদর রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। তাই বছরে একবার এ রাতের 'ইবাদাতই একজন মু'মিনকে সারা জীবনের সমান 'ইবাদাতের সুযোগ এনে দিতে পারে।

৩. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম উপায় হলো তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা।

---

৭৯. সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ৩, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং- ৯০৮

www.pathagar.com

৪. মাতাপিতার প্রতি অসদাচরণ মহান আল্লাহর ক্রোধের কারণ এবং তা ব্যক্তিকে নিশ্চিতরূপে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হলো তাঁর আদর্শের যথাযথ অনুসরণ করা এবং তাঁর নাম উচ্চারণ হলেই শ্রদ্ধাভরে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রামাদান মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দান করুন। তাঁর অফুরন্ত নি'আমাত দিয়ে আমাদেরকে সিক্ত করুন। তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ক্ষমা নসীব করুন। সর্বাবস্থায় মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যথাযথ ভালবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে পরকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর অপার করুণায় জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৮

আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের তাৎপর্য

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لها؟ قال لَا شَيْءَ إلا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بشَيْءٍ فَرَحَنَا بقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ .

সরল অনুবাদঃ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক লোক নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললো যে, কিয়ামাত কবে হবে? তিনি বললেনঃ তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? লোকটি বললোঃ এর জন্য আমি কোন প্রস্তুতিই নিতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি যাদেরকে ভালবাস তাদের সাথেই থাকবে। আনাস (রা.) বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর এই কথায় (তুমি যাদেরকে ভালবাস তাদের সাথেই থাকবে) আমরা এত খুশী হয়েছি যে, আর কোন কিছুতে আমরা এত খুশী হইনি। আনাস (রা.) আরো বলেনঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, আবূ বাকর (রা.) এবং 'উমারকে (রা.) ভালবাসি। আর আশা করি যে, তাঁদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাঁদেরই সাথে থাকতে পারব। যদিও তাঁদের ন্যায় নেক আমল আমি করতে পারি না।[৮০]

---

৮০. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৯, হাদীস নং- ৩৪৮৫

www.pathagar.com

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়:

আনাস ইবনু মালিক (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশিষ্ট খাদিম ও একনিষ্ঠ সহচর। আনাস তাঁর মূল নাম, আর উপনাম হলো আবূ হামযাহ ও আবূ সুমামা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'হামযাহ' নামক এক প্রকার সবজি খুটতে দেখে আদর করে বলেন- 'ইয়া আবা হামযাহ'। সেই থেকে তাঁর ডাক নাম হয়ে যায় আবূ হামযাহ। তাঁর মাতা হলেন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী 'উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান' (রা.)। ইয়াসরিবের বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গোত্রটিই ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আনাস (রা.) এর পিতা মালিক ইবনু নাদর এবং মাতা উম্মু সুলাইম সাহলা বিনতু মিলহান আলআনসারিয়্যাহ। উম্মু সুলাইম (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খালা হতেন।

আনাসের (রা.) এক চাচা আনাস ইবনু নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর দেহ কেটে কুটে বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আনাস (রা.) বলতেন: আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল।[৮১] আনাসের (রা.) বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং কুফরী অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর মা খাযরাজ গোত্রের বিত্তশালী ব্যক্তি আবূ তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বালক আনাসকেও সাথে করে তিনি আবূ তালহার বাড়িতে নিয়ে যান। এবং সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একান্ত সংস্পর্শে ছিলেন। ফলে অতি কাছে থেকে তাঁর অনেক কথা শুনা ও অনেক কাজ লক্ষ্য করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) নিজেই বলেন: আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালিগ

---

৮১. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৮৩

www.pathagar.com

হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে'। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে এই ওয়াসিয়াতটি করেন: ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মৃত্যুর পর আনাস (রা.) তাঁর গোটা জীবন হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬ টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ১৬৮ টি। বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন যে, দশ বছর বয়সে আমার মাতা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খিদমাতে পাঠান। তখন থেকে দশ বছর ধরে আমি তাঁর খিদমাতে নিয়োজিত থাকি। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যখন ইন্তিকাল হয়, তখন আমার বয়স বিশ বছর।

দ্বিতীয় খালীফাহ 'উমার (রা.) এর শাসনকালে তিনি বসরায় চলে যান এবং সেখানে দীনি 'ইলম শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকেন। অত:পর ৯১ হিজরীতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবং তিনিই ছিলেন বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের তাৎপর্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। আখিরাতের জীবনের আগমন অতিশয় সত্য ও নিশ্চিত। যে কোন মানুষের বেলায় এটি এক নির্ঘাত সত্য। এ সত্যকে অস্বীকারও করা যায় না, আবার এড়িয়েও চলা যায় না। দুনিয়ার জীবনে মানুষ ভাল এবং মন্দ যাই করে তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফল তাকে সেখানে দেয়া হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ .

www.pathagar.com

"অত:পর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে"।[৮২]

এ কারণেই আখিরাতের জীবনের পুরষ্কার এবং শাস্তির কথা মাথায় রেখেই একজন মু'মিনের দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়া উচিত। আলোচ্য হাদীসে তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে তাকে প্রথমে কিয়ামাত দিবসের প্রস্তুতির কথা জিজ্ঞেস করলেন। কেননা কিয়ামাত দিবসের সঠিক দিনক্ষণ জানার চেয়ে এর প্রস্তুতি গ্রহণ অনেক বেশি জরুরী।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

দুনিয়ার জীবন হলো আখিরাতের জীবনের কৃষিক্ষেত্র স্বরূপ। এ জীবনে মানুষ যে বীজ বপন করবে আখিরাতের জীবনে সে বীজেরই ফল লাভ করবে। এখানে যদি সে সঠিক বীজ বপন না করে কিংবা বীজ বপন করেও তার সঠিক পরিচর্যা না করে তাহলে আখিরাতে সে তার কাংখিত ফল আশা করতে পারে না। মানুষের দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী ও অনন্ত। আখিরাতের জীবনের আগমন সুনিশ্চিত, তবে সেই জীবনের কোন দিনক্ষণ মানুষকে জানানো হয়নি। তাই দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আখিরাতের নিশ্চিত ও অনন্ত জীবনের কল্যাণের আশায় যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً .

"যদি কেউ মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে এবং এরপর আল্লাহর কাছে মাফ চায় তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও মেহেরবান হিসেবেই পাবে"।[৮৩]

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً .

---

৮২. আলকোরআন: সূরা আয যিলযাল, ৯৯:৭-৮

৮৩. আলকোরআন: সূরা আন্ নিসা, ৪:১১০

www.pathagar.com

"আর যে নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে এমন লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে দেয়া হবে না"।[৮৪]

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ .

"অতএব যে মু'মিন অবস্থায় নেক আমল করবে তার শ্রম বৃথা যাবে না। (তার কাজের অবমূল্যায়ন করা হবে না), আর আমি তার জন্য তা লিখে রাখছি"।[৮৫]

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ .

"পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, যে লোকই নেক আমল করবে, সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন-যাপন করাবো। আর (আখিরাতে) অবশ্যই তার সবচেয়ে ভালো আমলের হিসাব অনুযায়ী বদলা দেবো"।[৮৬]

অতএব দুনিয়ার জীবনে আমরা ভাল কিংবা মন্দ যাই করি আখিরাতে তারই পূংখানুপুংখ ফল ভোগ করতে হবে আমাদেরকে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

মৃত্যু হলো মানুষের উভয় জীবনের মাঝে প্রতিবন্ধক। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আখিরাতের জীবনের সূচনা হয়। এজন্যেই আরবীতে একটি কথা আছে যে, "যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল তার কিয়ামাত শুরু হয়ে গেল"। অথচ কোন মানুষই জানে না যে, কখন তার মৃত্যু আসবে। কাজেই কিয়ামাত কখন হবে - তা জানা কিংবা না জানায় তার কোনই লাভ নেই। বরং যতটুকু সময় সে তার দুনিয়ার জীবনের জন্য পেল তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আখিরাতের জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করাই তার জন্য সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ।

একজন মু'মিন কাকে অধিক ভালবাসবে?

একজন মু'মিন সবচেয়ে বেশি ভালবাসবে তাঁর মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে এবং এর প্রতিফলন দেখাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

৮৪. আলকোরআনঃ সূরা আন্ নিসা, ৪:১২৪

৮৫. আলকোরআনঃ সূরা আল আম্বিয়া, ২১:৯৪

৮৬. আলকোরআনঃ সূরা আন নাহল, ১৬:৯৭

www.pathagar.com

সাল্লামকে সর্বাধিক ভালবাসার মাধ্যমে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাধিক ভালবাসা একজন মু'মিনের কাছে তার ঈমানেরই দাবী। কোন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার দাবী তখনই সত্য বলে প্রমাণিত হবে যখন সে দুনিয়ার অন্য সকলের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালবাসবে। এ বিষয়ে আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىَ أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْه منْ وَالده وَ وَلَده وَالنَّاس أَجْمَعِيْنَ .

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।"[৮৭]

শুধু তাই নয়, একজন মু'মিনের কাছে তার ঈমানের দাবী হলো- কেবল অন্য সব মানুষের চেয়ে নয় বরং তার নিজের চেয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালবাসা। একবার 'উমারের (রা.) হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে 'উমার (রা.) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে (আমার নিজেকে ছাড়া) দুনিয়ার সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর কসম! হে 'উমার, তুমি এখনো মু'মিন হতে পারনি। বিনীত কণ্ঠে 'উমার শুধালেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তাহলে কি করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানালেন: তোমাকে তোমার নিজের চেয়েও আমাকে অধিক ভালবাসতে হবে। 'উমার (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এখন থেকে আপনি আমার কাছে আমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: (الآن يا عمر) 'হে 'উমার! এতক্ষণে তুমি মু'মিন হলে'।[৮৮] 'উমারের (রা.) এ ঘটনায় আরো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাধিক ভাল না বেসে কেউ ঈমানের দাবীদার হলে তার এ দাবী মিথ্যা।

দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদেরকে ভালবাসার বেলাতেও আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের ভালবাসাই হবে মাপকাঠি। অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসে তাদেরকে ভালবাসতে হবে। আর যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে ভাল বাসেনা তাদেরকে ভালবাসা যাবে না। প্রকৃত মু'মিনের কাছে তার ঈমানের

---

৮৭. সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ১৫ ও সাহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭০
৮৮. সাহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩৪৯১

www.pathagar.com

দাবী এটিই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর এক হাদীসে আমরা একথারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তিনি বলেন-

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

আবূ উমামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য কাউকে ভালবাসলো এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই কাউকে ঘৃণা করলো, আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য কাউকে দান করলো এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকলো- সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো।[৮৯]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসার সর্বোত্তম নমুনা হলো, তাঁর আনীত আদর্শের পুংখানুপুংখ অনুসরণ করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত বিধানকেই অনুকরণীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহও চান যে, একজন মু'মিন এভাবেই তাঁর রাসূলকে ভালবাসুক। এজন্যেই তিনি তাঁর নিজের ভালবাসা ও সন্তুষ্টিকে নাবীর ভালবাসার উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"হে নাবী! আপনি জানিয়ে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসার দাবীদার হয়ে থাক, তবে আমার অনুকরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। এবং তোমাদের গুনাহরাজি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[৯০]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ আরো ঘোষণা করছেন:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

"আপনার রবের কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না

---

৮৯. সুনান আবী দাউদ, খ. ৪, পৃ. ২২০, হাদীস নং- ৪৬৮১

৯০. আলকোরআন: সূরা আলি 'ইমরান ৩:৩১

www.pathagar.com

তারা তাদের নিজেদের ভিতরকার ব্যাপারাদি নিরসনে আপনাকে বিচার ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেবে। অত:পর আপনার ফায়সালার ব্যাপারে মনের মধ্যে কোন প্রকার ইতস্তত: বোধ করবে না এবং তা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।"[৯১]

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসতে হবে সর্বাধিক। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি সর্বাধিক ভালবাসা না থাকলে মু'মিনই হওয়ার দাবী করা যাবে না।

উত্তম বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব:

মানব জীবনে উত্তম বন্ধু নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা মানুষ সাধারণত তার বন্ধু-বান্ধব ও সাথী-সঙ্গীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। যে যার সাথে বেশি সখ্যতা রাখে তার আচার-আচরণের প্রতিচ্ছবি তার মাঝে পাওয়া যায়। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর স্বভাব-চরিত্রেই চরিত্রবান হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন খেয়াল রাখে যে সে কার সাথে বন্ধুত্ব রাখছে।[৯২]

কেবল দুনিয়ার জীবনের দিক থেকেই নয়, বরং আখিরাতের জীবনের দিক থেকেও বন্ধুত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মানুষ যাদেরকে ভালবাসে, যাদের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক থাকে, তাদের সাথেই পরকালে তার হাশর হবে। তাদের মতই তার পরকালীন পরিণতি হবে। উত্তম বন্ধু আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিবে যাতে আমাদের দীন ও দুনিয়ার উপকার হবে। আল্লাহর আনুগত্য, উত্তম চরিত্র, সুন্দর কথা, কাজ ও ব্যবহারের দিকে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। অন্যদিকে অধম কিংবা মন্দ সঙ্গী তার সাথীর জন্য বিপদজনক। সে তাকে ধ্বংস এবং প্রবৃত্তির দিকে প্ররোচিত করে। তাই এই বন্ধুত্ব যদি আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে না হয় তাহলে তারা কিয়ামাতের দিবসে পরস্পরের শত্রু হয়ে

---

৯১. আলকোরআন: সূরা আন্-নিসা ৪:৬৫

৯২. আল-মুসতাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং- ৭৩১৯

www.pathagar.com

যাবে। কাজেই ভাল সঙ্গী তালাশ করা এবং মন্দ সঙ্গী হতে দূরে থাকা প্রত্যেক মু'মিনের নৈতিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ .

"ঐ দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া আর সব বন্ধু-বান্ধবই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে"।[৯৩] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا عَلَى أَعْمَالِهِمْ حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ زُمْرَتِهِمْ فَحُوْسِبَ بِحِسَابِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ أَعْمَالَهُمْ .

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কর্মকে পছন্দ করল কিয়ামাতের দিন সে তাদের দলভূক্ত হয়েই হাশরে উত্থিত হবে। এবং সেও তাদের কর্মকান্ডের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে যদিও সে নিজে তা করেনি।[৯৪] অপর বর্ণনায় এসেছে:

إِنَّ اللهَ يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَغْفِرَ لِقَوْمٍ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ مَعَهُمْ .

আল্লাহ তা'আলা ঐ কাওমকে ক্ষমা করতে লজ্জাবোধ করেন যাদের মধ্যে এমন (অসৎ/পাপাচারী) ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের দলভূক্ত নয়, তবে পরে তিনি তাকেও তাদের সাথে ক্ষমা করে দেন।[৯৫]

সুতরাং আখিরাতের জীবনে মহান আল্লাহর নিকট থেকে ভাল ফলাফল প্রাপ্তির জন্য দুনিয়ার জীবনে উত্তম বন্ধু নির্বাচন অপরিহার্য।

হাদীসের শিক্ষা:

- কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে সরাসরি তার জবাব না দিয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষন করা যায়।
- কিয়ামাত কবে হবে সেই গবেষণা কোন ফল বয়ে আনবে না যদি তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা না হয়।
- আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে সর্বাধিক ভালবাসা ঈমানের অনিবার্য দাবী।

---

৯৩. আলকোরআন: সূরা আয-যুখরুফ, ৪৩:৬৭
৯৪. কানযুল 'উম্মাল, খ. ৯, পৃ. ১১, হাদীস নং- ২৪৭৩০
৯৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৪৭৩৩

www.pathagar.com

- অন্য মানুষের সাথে বন্ধুত্বের মাপকাঠিও হবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভালবাসা।
- আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসা পরকালীন সফলতার সোপান।
- একজন মু'মিনের বন্ধু নির্বাচনে সদা সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।
- কিয়ামাতের দিন-ক্ষণ জানার চেয়ে তার জন্য প্রস্তুতি নেয়া মানুষের জন্য অনেক বেশি জরুরী।
- সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন। তাঁকে অত্যধিক ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেদের পরকালীন সফলতা নিশ্চিত করতে পেরে তারা ছিলেন আনন্দিত।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করা।
- ব্যক্তি কাদের সাথে চলে তা দিয়েই তার ভাল মন্দ আন্দাজ করা যায়।
- প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুই তার জন্য কিয়ামাত স্বরূপ। সুতরাং আসল কিয়ামাতের দিনক্ষণ তালাশ না করে সদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ হাদীসের আলোকে নিজেদের আখিরাতের জীবনের সফলতার লক্ষ্যে তাঁর প্রিয় নাবীকে সর্বাধিক ভালোবেসে তাঁরই রেখে যাওয়া আদর্শের ভিত্তিতে পথ চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ৯

গর্ব ও অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম

عن عبد الله بن مَسْعُودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ من كِبْرٍ . قال رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قال إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ . الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ الناس .

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ গর্ব অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললোঃ কোনো ব্যক্তি এটাই পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক এবং জুতা জোড়াও খুব সুন্দর হোক, (তাও কি অহংকার)? তিনি বললেনঃ আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে, সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।[৯৬]

হাদীসটির বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনাকারী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)। তাঁর মূল নাম 'আব্দুল্লাহ। পিতার নাম মাস'উদ, কুনিয়াত আবূ 'আবদির রহমান এবং মাতার নাম উম্মু 'আব্দ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদিম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে সাথে ছিলেন। এ কারণে হাদীস বর্ণনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

---

৯৬. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৯৩, হাদীস নং- ৯১

www.pathagar.com

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন একজন কিশোর। কুরাইশ গোত্রের এক সর্দার 'উকবা ইবনু আবূ মু'ইতের একপাল ছাগল নিয়ে তিনি মাক্কার গিরিপথগুলোতে চরিয়ে বেড়াতেন। লোকেরা তাকে 'ইবনু উম্মি 'আব্দ' বলে ডাকতো। নাবীজীর সাথে তার প্রথম সাক্ষাত এবং ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি প্রতিদিন সকালে 'উকবার ছাগলের পাল নিয়ে বের হয়ে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, দু'জন বয়স্ক লোক, যাদের চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ বিরাজমান, দূর থেকে তার দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ছিলেন খুবই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। পিপাসায় তাঁদের গলা ও ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নিকটে এসে লোক দু'টি তাকে সালাম জানিয়ে বললেন, তোমার ছাগলগুলো থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দাও। আমরা তা পান করে আমাদের পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং আমাদের শুকনা গলা একটু ভিজিয়ে নিই।

তাঁদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ছাগলগুলি তো আমার নয়। আমি এগুলির রাখাল ও আমানতদার মাত্র'। লোক দু'টি এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং তাদের মুখমন্ডলে উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠলো। তাদের একজন আবার বললেন: 'তাহলে এমন একটি ছাগী আমাকে দাও যা এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি'। ইবনু মাস'উদ তখন নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট ছাগীর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ছাগীটি ধরে ফেলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে হাত দিয়ে ধরে তার ওলান মলতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে ইবনু মাস'উদ অবাক বিস্ময়ে মনে মনে বলছিলেন: 'কখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি এমন ছাগী কি দুধ দেয়? কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগীর ওলানটি ফুলে উঠে এবং প্রচুর পরিমাণে দুধ বের হতে থাকে। দ্বিতীয় লোকটি গর্তবিশিষ্ট পাথর উঠিয়ে নিয়ে বাঁটের নিচে ধরে তাতে দুধ ভর্তি করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পান করেন এবং তাকেও পান করান। ইবনু মাস'উদ বলেন: আমি যা দেখছিলাম তা সবই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন সেই পুণ্যবান লোকটি ছাগীর ওলানটি লক্ষ্য করে বল্লেন: 'চুপসে যাও'। আর অমনি সেটি পূর্বের ন্যায় চুপসে গেল। তারপর আমি সেই পুণ্যবান লোকটিকে

www.pathagar.com

অনুরোধ করলাম: 'আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: "তুমি তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক"। এই পুণ্যবান লোকটিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বাকর আস্‌সিদ্দীক (রা.)। ইবনু মাস'ঊদ (রা.) এর কাছে সেদিন যেমনি এই পুণ্যবান লোক দু'টিকে ভাল লেগেছিল, তাঁদের কাছেও তেমনি ছেলেটির আচরণ, আমানতদারী ও বিচক্ষণতা খুব চমৎকার মনে হয়েছিল। তাঁরা ছেলেটির মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভলক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ ঘটনার কিছুদিন পরেই 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন একনিষ্ঠ খাদিম হিসেবে উৎসর্গ করেন।

'আব্‌দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) ছায়ার মত নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করতেন। সফরে বা ইকামাতে, গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে সব সময় তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমালে তিনি তাঁকে ঘুম থেকে জাগাতেন, গোসলের সময় পর্দা করতেন, বাইরে যাবার সময় জুতা পরিয়ে দিতেন, ঘরে প্রবেশের সময় জুতা খুলে দিতেন এবং তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করতেন। হুজরায় অবস্থানকালেও তিনি তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সকল বিষয়ে তাঁকে অবগত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'সাহিবুস সির' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল গোপন বিষয়ের অধিকারী বলা হতো।

তিনি সুললিত কণ্ঠে আলকোরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনিই প্রথম মাক্কায় কাফিরদের সামনে প্রকাশ্যে আলকোরআন তিলাওয়াত করেন। 'উমার (রা.) বলেন: একদিন রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আবূ বাকর (রা.) এর সাথে কথা বলছিলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। কিছু সময় পর আমরা বের হয়ে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি মাসজিদে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর কোরআন তিলাওয়াত শুনলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন: 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে- সে যেন ইবনু উম্মি 'আব্‌দের পাঠের অনুসরণে কোরআন পাঠ করে'। এরপর ইবনু মাস'ঊদ বসে দু'আ শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আস্তে আস্তে তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন: 'চাও, দেয়া হবে, চাও, দেয়া হবে'। আলকোরআনের বিধানাবলী তিনি

www.pathagar.com

নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করে চলতেন। এক হাদীসে তিনি বলেন: আমরা আলকোরআনের দশটি আয়াতকে অতিক্রম করতাম না যতক্ষণ না সেই দশটি আয়াতকে বাস্তবে রূপায়ন করতাম। তিনি একাধারে ছিলেন হাফিয, মুহাদ্দিস এবং 'আবিদ। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দিয়ে আলকোরআন পাঠ করাতেন এবং নিজে তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন।

ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হাবশায় এবং পরে মাদীনায় হিজরাত করেন। ৩২ হিজরী মোতাবেক ৬৫২ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে গর্ব ও অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের অগণিত সৎ গুণও অনেক সময় অহংকারের কারণে নিষ্ফল হয়ে যায়। কেবল বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমেই নিজের অন্য সকল গুণের স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব। লোক দেখানোর জন্য কেউ যদি কোন ভাল কাজ করে, ভাল কথা বলে তাহলে তা কেবল ঐ লোকদের বাহবাই এনে দেবে, আল্লাহর কাছে এসব ভাল কাজের কোনই মূল্য নেই। আর যদি তা হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং পরকালে তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাহলে তা তিনি গ্রহণ করবেন এবং পরকালে তাকে এর উপযুক্ত বদলা দেবেন। আর মানুষদের মাঝে তার খ্যাতি ও তার ভাল কাজের স্বীকৃতি তো এমনিতেই হবে।

মহান আল্লাহ হলেন একমাত্র অমুখাপেক্ষী। তাই অহংকার কেবল তাঁরই শোভা পায়। কোন সৃষ্টিই অমুখাপেক্ষী নয়। তাই তাদের বেলায় কোন ক্ষেত্রেই অহংকার মানায় না। মহান আল্লাহ অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। আলকোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

"মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কথা বল না এবং পৃথিবীতে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন বড়াইকারী ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না"।[৯৭]

বাংলায় কথা আছে- অহংকার পতনের মূল। আলোচ্য হাদীসের বক্তব্যও তাই। মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হলো সৎ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও প্রতিদান

---

৯৭. আলকোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:১৮

www.pathagar.com

হিসেবে জান্নাত লাভ। অথচ মানুষ যত ভাল কাজই করুক যদি তা গর্ব ও অহংকার মিশ্রিত হয় তাহলে এসব ভাল কাজ দিয়ে সে জান্নাত লাভ করতে পারবে না। এ হাদীস আমাদেরকে আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হওয়ার সঠিক পন্থা বলে দিয়েছে। তাই মানব জীবনে হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না- এরূপ নেতিবাচক কথা বলে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষন করলেন। কেননা জান্নাতে যাওয়াই সৎকর্মশীলদের প্রধান লক্ষ্য। এবার তারা মনোনিবেশ করলে তিনি জানালেন যে, এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে মজ্জাগতভাবেই অহংকারের বীজ লুকায়িত থাকে। সে চায় যে লোকেরা তাকে ভাল বলুক, তাকে দেখে খুশী হোক, তার কাজ কর্ম দেখে তাকে বাহ্বা দিক ইত্যাদি। এ কারণেই একজন সাহাবী তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন- মানুষ তো এটাই পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক এবং জুতা জোড়াও খুব সুন্দর হোক, (তাও কি অহংকার)? অর্থাৎ এ তো হলো মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জবাব দিলেন যে, প্রবৃত্তিগতভাবে মানুষ যে সৌন্দর্যপ্রিয়, এটা দোষের কিছু নয়। অহংকার আর সৌন্দর্যপ্রিয়তা এক জিনিস নয়। মহান আল্লাহ নিজেও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। বান্দাহকে তিনি যেসব নি'আমাত প্রদান করেন তিনি চান যে তার বহি:প্রকাশ বান্দার মাঝে ঘটুক। আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমাতকে সে লুকিয়ে রাখুক কিংবা উপভোগ না করুক, এটা তিনি চান না। বরং নি'আমাত উপভোগ করা ও তাঁর যথাযথ শুকরিয়া আদায় করাই তিনি বান্দাহর কাছে চান। এ প্রসঙ্গেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا فِيْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ مَخِيْلَةٍ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

www.pathagar.com

'আমর ইবনু শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমরা খাও, পান কর এবং দান কর। তবে তাতে যেন অপচয় ও অহংকার না থাকে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর দেয়া নি'আমাতের চিহ্ন তাঁর বান্দাহর মাঝে দেখতে পছন্দ করেন। (এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের নিকট সাহীহ। কিন্তু তারা এটি বর্ণনা করেননি)।[৯৮]

অর্থাৎ সামর্থ থাকলে পানাহারে কমতি করো না। আর দান-খয়রাতেও কমতি করো না। পানাহার ও দানে সামর্থের তুলনায় কম করা কৃপণতা, আর সামর্থের চেয়ে বেশি করা অপচয় ও অহংকার।

অন্য বর্ণনায় এ প্রসঙ্গে আরো পরিষ্কার কথা এসেছে। যেমন:

عن زُهَيْرِ بن أبي عَلْقَمَةَ الضُّبَعِيِّ قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ سَيِّئُ الْهَيْئَةِ فقال أَلَكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِ الْمَالِ قَالَ فَلْيُرَ عَلَيْكَ فإن الله عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا وَلا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ .

যুহাইর ইবনু আবী 'আলকামাহ আদ দুবা'ঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক লোক অসুন্দর ভুষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কি ধন সম্পদ নেই? সে বললো- হ্যা, সব ধরনের সম্পদই আছে। তখন তিনি বললেন: তাহলে তোমার বেশ-ভুষায় তা যেন পরিলক্ষিত হয়। কেননা মহান আল্লাহ তার (তাঁর দেয়া নি'আমাতের) চিহ্ন তাঁর বান্দাহর মাঝে সুন্দররূপে দেখতে পছন্দ করেন। কিন্তু তিনি কষ্ট ও অস্বচ্ছলতার ভাব প্রদর্শন পছন্দ করেন না।[৯৯]

কাজেই মহান আল্লাহ যাকে তাঁর নি'আমাত দিয়েছেন তার উচিত নিজের বেশ-ভুষা, আহার-বিহার, দান-খয়রাত ইত্যাদি সব কিছুতে সেই নি'আমাতের বহি:প্রকাশ ঘটানো। আলকোরআনে এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর নির্দেশনা হলো- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "আর তোমার রবের নি'আমাতের কথা প্রকাশ করো"।[১০০] সুতরাং যাকে আল্লাহ সত্য ও সঠিক কথা লেখার যোগ্যতা দিয়েছেন তার তা লেখা, যাকে সত্য বলার যোগ্যতা দিয়েছেন তার তা বলা, যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তার তা যথাস্থানে ব্যয় করা ইত্যাদি সবই এই নি'আমাতের প্রকাশ ঘটানো বৈকি।

---

৯৮. আল মুসতাদরাক 'আলা আস সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ১৫০, হাদীস নং- ৭১৮৮

৯৯. আল মু'জামুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ২৭৩, হাদীস নং- ৫৩০৮

১০০. আলকোরআন: সূরা ওয়াদ দোহা, ৯৩:১১

www.pathagar.com

আর এ নি'আমাতের জন্য বেশি বেশি করে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা ও তাঁর রহমত কামনা করা উচিত। কেননা নিজের আমল দিয়ে কেউই পার পাবে না, কেবল মহান আল্লাহর রহমত হলেই কোন ব্যক্তি জান্নাত লাভ করতে পারবে। এক হাদীসে এসেছে-

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের দ্বারা নাজাত পাবে না। লোকেরা বললো, আপনিও (আপনার কাজের দ্বারা নাজাত) পাবেন না? তিনি বললেন: না, আমিও না। তবে যদি আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখেন। সুতরাং সঠিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো, সকাল-বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর 'ইবাদাত করো। (এসব কাজে) মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে।[১০১]

মহান আল্লাহর কাছে বান্দাহর নেক আমল গ্রহণযোগ্য হয়ে তাঁর নিকট প্রতিদান হিসেবে জান্নাত লাভের জন্য বান্দাহর মধ্যে বিনয় ও নিরহংকারী মনোভাব থাকা খুবই জরুরী। আমলের মধ্যে বিনয়ী ভাব প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক এবং সেই আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার লক্ষণ। আর আমলের মধ্যে অহংকারী ভাব কুফরের পরিচায়ক এবং সেই আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার লক্ষণ। এ কারণেই হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, ঈমানকে অহংকারের বিপরীতে স্থির করা হয়েছে এবং অহংকারকে জান্নাতের বিপরীতে স্থির করা হয়েছে। অর্থাৎ বিন্দুমাত্র অহংকার থাকলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আর বিন্দুমাত্র ঈমান থাকলে জাহান্নামে যেতে হবে না। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে-

---

১০১. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ২৩৭৩, হাদীস নং- ৬০৯৮

www.pathagar.com

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ من إِيمَانٍ ولا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ من كِبْرِيَاءَ.

'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: এমন কোনো ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে। আর এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে।[১০২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১০৩]
অতএব একজন প্রকৃত মু'মিন হিসেবে এবং জান্নাতের প্রত্যাশী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিজেদের সকল কাজে বিনয়ী হওয়া এবং মহান আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করা। কেননা তাঁর রহমত ছাড়া কেবল নিজের আমলের বিনিময়ে কেউই জান্নাতে যেতে পারবে না।

হাদীসটির শিক্ষা:

১. স্বভাবগত সৌন্দর্যপ্রিয়তা কোন দোষনীয় বিষয় নয়।
২. মহান আল্লাহ বান্দাহর মাঝে তাঁর দেয়া নি'আমাতের প্রতিচ্ছবি দেখতে চান।
৩. সামর্থবান ব্যক্তির কৃপণতা নিন্দনীয়। তবে অসচ্ছল ব্যক্তির হিসেব করে চলা দোষনীয় নয়।
৪. প্রকৃত মু'মিন কখনো অহংকারী হতে পারে না।
৫. অহংকারী কখনো জান্নাতে যেতে পারে না।
৬. মহান আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।
৭. সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করা অহংকারীর লক্ষণ।
৮. মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করাও অহংকারীর লক্ষণ।

---

১০২. সাহীহ মুসলিম, বাবু তাহরীমিল কিবর, খ. ১, পৃ. ৯৩, হাদীস নং- ৯১
১০৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৯. শুধু পানাহারই নয়, দান-খয়রাত করার বেলায়ও সামর্থ অনুযায়ী করা উচিত।

১০. আল্লাহ যাদেরকে অধিক সম্পদশালী করেছেন, দান-খয়রাত ও সামাজিক কাজকর্মেও তাদের অগ্রণী ভূমিকা থাকা উচিত।

১১. অহংকারী ব্যক্তিরা পরকালে জবাবদিহীর কথা ভুলে যায়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সদা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকার তাওফীক দান করুন। নিজের জন্য যা পছন্দ করি অপরের জন্যও তা পছন্দ করার যোগ্যতা দিন। সামর্থ অনুযায়ী সুন্দর ও স্বাচ্ছ্যন্দপূর্ণ জীবন যাপন করার মানসিকতা দিন। অপরের দু:খ লাঘবেও সামর্থ অনুযায়ী ভূমিকা রাখার তাওফীক দিন। জীবনের যেক্ষেত্রে তিনি আমাদেরকে যতটুকু নি'আমাত দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা দিন। তাঁর অফুরন্ত নি'আমাত দিয়ে আমাদের পরিবারগুলোকে শান্তির নীড়ে পরিণত করুন। পরকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর অপার করুণায় জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

----

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১০

পাঁচটি বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

সরল অনুবাদঃ

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নাসীহাত করতে গিয়ে বলেছেনঃ তুমি পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের আগে গুরুত্ব দিবে। (এক) বার্ধক্য এসে যাওয়ার আগে তোমার যৌবনকালকে। (দুই) অসুস্থতা এসে যাওয়ার আগে তোমার সুস্থতাকে। (তিন) দারিদ্রতা এসে যাওয়ার আগে তোমার সচ্ছলতাকে। (চার) ব্যস্ততা এসে যাওয়ার আগে তোমার অবসরকে এবং (পাঁচ) মৃত্যু এসে যাওয়ার আগে তোমার জীবনকে।[১০৪] ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এটি সাহীহ, তবে তাঁরা এটি তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেননি।

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর চাচাত ভাই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর চাচা 'আব্বাস ইবনু 'আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র। এছাড়া তাঁর মাতা লুবাবাহ বিনতুল হারিস ছিলেন রাসূলপত্নী মাইমূনাহ (রা.) এর বোন। ফলে বাবা এবং মা উভয়ের দিক থেকেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আত্মীয়। এ কারণেই ইবনু 'আব্বাস (রা.) ছিলেন সকলের মাঝে অতিশয়

---

১০৪. আল-মুসতাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ৩৪১, হাদীস নং- ৭৮৪৬

www.pathagar.com

সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী। হিজরাতের তিন বছর পূর্বে নবুওয়াতের দশম বছর তাঁর জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩/১৪ বছর।

অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও পান্ডিত্য বিবেচনা করেই তাঁকে (حَبْرُ الْأُمَّةِ وَ بَحْرُهَا) 'হাবরুল উম্মাতি ওয়া বাহরুহা' অর্থাৎ এই উম্মাতের বিশিষ্ট পন্ডিত ও অতি উত্তম ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শিশু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করে বলেছিলেন: اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ 'হে আল্লাহ! তাঁকে তুমি দীনের সঠিক বুঝ দাও এবং দীনের যথার্থ ব্যাখ্যা শক্তি প্রদান কর'। পরবর্তীতে তিনি 'রাঈসুল মুফাস্‌সিরীন' বা মুফাস্‌সির সর্দার নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি দুই দুই বার জিবরীল (আ.) কে দেখতে পান। দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁকে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন, যদিও তিনি ছিলেন অনেক সাহাবীর তুলনায় বয়:কনিষ্ঠ। অর্থাৎ বয়সে ছোট হলেও তিনি ছিলেন অনেক বয়োজৈষ্ঠ্য সাহাবীর তুলনায় অধিক জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। সম্ভবত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর দু'আর প্রভাবে তিনি এতটা প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের প্রচার ও প্রসারে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। বাল্যকালে মাত্র কয়েক বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সংস্পর্শ পেলেও তিনি হাদীস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০ টি।

'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) এর শাসনামলে ৬৮ হিজরী সালে তায়েফে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

হাদীসটিতে বর্তমান সময় এবং চলমান পরিস্থিতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে বলা হয়েছে। সুদিন-দূর্দিন, সুস্থতা-অসুস্থতা, যৌবন-বার্ধক্য, ব্যস্ততা-অবসর এবং জীবন-মৃত্যু ইত্যাদিকে মানুষ সবসময় নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অজুহাত কিংবা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ জানে না যে তার বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভবিষ্যত আরো সুখকর কিংবা সুবিধাজনক হবে। তাই যখন যে পরিস্থিতি এবং যে অবস্থায় আমরা বিরাজ করি তাকেই সর্বাপেক্ষা উত্তম ভেবে তা থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করা উচিত। কেননা কেউ জানে না

www.pathagar.com

যে, তার বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত আরো সুদিন হবে, আরো সুস্থতর হবে, আরো শক্তি সামর্থবান হবে, আরো অবসর হবে এবং আরো অনেক দিন সে বাঁচবে। বরং যে কোন সময় এসব অনাকাংখিত অবস্থার মুখোমুখি তার হওয়া লাগতে পারে। বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল অবস্থা কে না চায়? অথচ এর কোন গ্যারান্টি তার কাছে নেই। আবার আরো খারাপ পরিস্থিতির দিকে সে ধাবিত হতে পারে- এটাও অস্বাভাবিক নয়। তাই বর্তমান পরিস্থিতিকেই স্বাভাবিক ধরে নিয়ে এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব।

মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। সে জানে না যে তাকে কখন কোন্ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। ভবিষ্যত বর্তমানের চেয়ে ভাল হবে এ আশা সে করতেই পারে। কিন্তু এ নিশ্চয়তা যেহেতু তার কাছে নেই তাই বর্তমানকে অবহেলা করার কারণে হিতে বিপরীতও হতে পারে। জীবন চলার পথে মানুষ যেসব অবস্থাকে নিজের কাজের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হবে বলে মনে করে এবং সেই অবস্থা প্রাপ্তির আশায় কাজকে ফেলে রাখে, সেসব অবস্থাকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাণীমাত মনে করে কাজে লাগাতে বলেছেন। তাই মানব জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হলো যে, সে অধিকাংশ সময় নি'আমাত থাকা অবস্থায় সে নি'আমাতের কদর বুঝতে পারে না। আর নি'আমাত যখন চলে যায় তখন সেই নি'আমাতের কদর বা মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়। কিন্তু নি'আমাত চলে যাবার পর তার কদর বুঝলেও অনেক ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই প্রকৃত মু'মিন ও বুদ্ধিমান সেই যে নি'আমাত থাকতেই তার কদর বুঝে এবং তা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হয়। আলোচ্য হাদীসটিতে মানুষের জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি অবস্থাকে অন্য পাঁচটি অবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। সেই অবস্থাগুলো হলো:

(এক) বার্ধক্য এসে যাওয়ার আগে যৌবনকালকেঃ মানুষের যৌবনকাল তার জন্য মহান আল্লাহর এক অপার নি'আমাত। যৌবন চলে গিয়ে বার্ধক্য চলে আসলে তা আর ফিরে আসে না। অথচ যৌবনে সে যেসব কাজ আঞ্জাম দিতে পারতো এবং যেভাবে সূচারুরূপে তা করতে সক্ষম ছিলো বার্ধক্য এসে গেলে তার পক্ষে আর সেসব কাজ করা সম্ভব হয় না এবং সেই মানসম্মতভাবে করতে চাইলেও আর সে করতে পারে না। আরবের এক কবি তাই আফসোস করে এভাবে বলেছিলেন- 'হায়! যৌবন যদি আবার ফিরে আসতো'।

www.pathagar.com

মানুষের আয়ুষ্কালের মধ্যে যৌবনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যৌবনে এমন অনেক কাজ করা যায় যা বার্ধক্য এসে গেলে আর শত চেষ্টা করেও করা সম্ভব হয় না। যৌবনকালকে যারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে তারাই বেশি সফলকাম। আর যারা যৌবনকালকে অবহেলা করে তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই তাঁর দা'ওয়াতী কাজে যুবকদেরকে বেশি বেশি টার্গেট করতেন। তাদের প্রতি তাঁর ছিল এক বিশেষ নজর। কেননা তারা তাদের মেধা-শ্রম ও আগ্রহ-উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে নিজেরাও যে কোন ব্যাপারে অনেক উন্নতি করতে পারে এবং সমাজের অন্যান্যদের উপরও অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। ইসলামে তাই যৌবনের 'ইবাদাতকে উত্তম বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত শ্রেণির লোকের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁরা হাশরের ময়দানের কঠিনতম সময়ে মহান আল্লাহর 'আরশের নিচে ছায়া পাবে। সেই সাত শ্রেণির মধ্যে একটি হলো ঐসব যুবকদল যারা আল্লাহর 'ইবাদাতের মধ্য দিয়ে নিজেদের যৌবনকালকে অতিবাহিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মাক্কী জীবনের কঠিন সময়গুলোতে একদল যুবক সাহাবীই ইসলামের দা'ওয়াত গ্রহণ করে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করেছিলেন।

(দুই) অসুস্থতা এসে যাওয়ার আগে সুস্থতাকে: সুস্থতা মহান আল্লাহর আরেক অপার মহিমা। সুস্থতার সময় মানুষ আল্লাহর 'ইবাদাত করার যে সামর্থ রাখে, অসুস্থ হয়ে গেলে আর তার সে সামর্থ থাকে না। তখন মন চাইলেও তার শরীরে কোলায় না বিধায় সে 'ইবাদাতে ততটা মনোযোগ দিতে পারে না। আর অসুস্থতা যেহেতু মানুষকে বলে কয়ে আসে না, তাই যখন সে যতটুকু সুস্থ তাকেই নি'আমাত মনে করা উচিত। অন্যথায় যে সুস্থতার আশায় সে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো রেখে দিয়েছিল সে সুস্থতার দেখা হয়ত আর কোনদিন নাও মিলতে পারে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই যে তার বর্তমান অবস্থাকেই স্বাভাবিক ধরে নিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে সর্বোচ্চ মনোযোগী হয়। কেননা কে জানে যে, বর্তমানে তার শরীরের যে অবস্থা ভবিষ্যতে তা হয়তো আরো অবনতির দিকে যাবে। তাহলে যে আশায় বুক বেঁধে সে তার বর্তমান অবস্থাকে হেলায় কাটিয়েছিল সামনে অবস্থা আরো খারাপ হলে সে তার সাধ্যের ভিতরকার নূন্যতমটুকুও হয়ত আর করতে

www.pathagar.com

পারবে না। এ অবস্থাটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: দু'টো নি'আমাত এমন আছে যেগুলোতে অনেক মানুষই ধোকায় পতিত হয়। তার একটি হলো সুস্থতা, আর অপরটি হলো অবসর।[১০৫] ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এটি সাহীহ হাদীস, তবে তাঁরা এটি তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেননি।

এ হাদীসটিতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার চিত্রই ফুটে উঠেছে। মানুষ সচরাচর এ দু'টো সময়কে হেলায় কাটিয়ে দেয়। সে ভাবে যে, আরেকটু সুস্থ হলে অথবা আরেকটু অবসর হলে কাজটি ভালভাবে করব। এই ভেবে সে তার কাজকে জমিয়ে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণে আরেকটু সুস্থ না হয়ে হয়ত আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। অথবা আরেকটু অবসর না হয়ে হয়ত আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার পক্ষে আর এ কাজটি করা সম্ভবই হয়ে উঠে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাৎক্ষণিকভাবে একে গাণীমাত মনে করে এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে আহবান করেছেন।

(তিন) দারিদ্রতা এসে যাওয়ার আগে সচ্ছলতাকে: দারিদ্রতা ও সচ্ছলতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। প্রত্যেক মানুষই অপর মানুষের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে দরিদ্র ও আপেক্ষিকভাবে সচ্ছল। কেননা এ দুনিয়ায় মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। তাই প্রত্যেকেই ভাবে যে, আমার এটার অভাব, ওটার অভাব। অমুকের মত আমারও যদি এটা থাকত ওটা থাকত ইত্যাদি। যদিও আরেকজনের মত তারও এটা/ওটা হবে এ নিশ্চয়তা কারো কাছেই নেই। তথাপি মানুষ আরেকটু সচ্ছলতার দোহাই দিয়ে বর্তমানেই করা সম্ভব এমন অনেক গুরু দায়িত্বকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু এটি তার জন্য চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কেননা বর্তমানে তার যা আছে তাও যদি সে সময়মত বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত সে এটিও আর বিনিয়োগ করতে পারবে না। এ সুযোগটিও হয়ত তার

---

১০৫. আল-মুসতাদরাক 'আলা আস-সাহীহাইন, খ. ৪, পৃ. ৩৪১, হাদীস নং- ৭৮৪৫

www.pathagar.com

হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই যখন যতটুকু সচ্ছলতা আছে একেই নিজের পুঁজি ভেবে তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এর চেয়ে ভাল অবস্থার দোহাই দেয়া নিজেকে প্রলোভন দেয়ার শামিল। কেননা আগামীর কোন তথ্যই তার কাছে নেই। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

"কিয়ামাতের 'ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। তিনিই বৃষ্টি নাযিল করেন। তিনিই জানেন যে, মায়ের পেটে কী তৈরী হচ্ছে। কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী কামাই করবে এবং কেউ জানে না যে, কোন্ জায়গায় তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহই সবকিছু জানেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন"।[১০৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُ مَا تَضَعُ الْأَرْحَامُ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ إِلاَّ اللهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ وَلاَ تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ.

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: গাইব/অদৃশ্যের চাবিকাঠি পাঁচটি। যথা- আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে, মায়ের পেটে কী তৈরী হচ্ছে। শুধু তিনিই জানেন যে, আগামীকাল কী হবে। বৃষ্টি কখন হবে তাও কেবল তাঁরই জানা। কোন প্রাণী জানে না যে, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং এও জানে না যে, কিয়ামাত কবে হবে।[১০৭]

সুতরাং যেখানে আগামীকালের রিয্ক প্রাপ্তি অথবা অন্য কোন আর্থিক অগ্রগতির খবরই তার কাছে নেই তাহলে সে কিসের উপর ভিত্তি করে অধিক সচ্ছলতার আশায় বর্তমান অবস্থাকে অবহেলা করবে? এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

---

১০৬. আলকোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:৩৪

১০৭. সাহীহুল বুখারী, খ. ৬, পৃ. ২৬৮৭, হাদীস নং- ৬৯৪৪ ও সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ১, পৃ. ২৭২, হাদীস নং- ৭০

www.pathagar.com

عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

'আদী ইবনু হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমরা আগুনকে ভয় কর একটা খেজুরের আটির খোসা দিয়ে হলেও।[১০৮] খেজুরের বিচির উপরে যে পাতলা সাদা আবরণ থাকে তাকে আরবীতে 'শিক্ক' বলা হয়। এর দ্বারা এখানে অতি নগন্য পরিমাণ অর্থ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে তোমার যা আছে (তা যত অল্পই হোক না কেন) তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার মাধ্যমেই তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হও। তাই আরেকটু সচ্ছলতা আসুক তারপর এটা করব, ওটা করব এ রকম ভাবা কিছুতেই সমীচীন নয়।

(চার) ব্যস্ততা এসে যাওয়ার আগে অবসরকে: ব্যস্ততা ও অবসর এ দু'টোই মহান আল্লাহর নি'আমাত। ব্যস্ততা এ অর্থে নি'আমাত যে, এটি মানুষকে অনেক অন্যায় ও বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকতে সহযোগিতা করে। সে তার নিজের গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত বিধায় শাইতান তাকে অন্য কাজে মনোযোগী করার সুযোগ পায় না। আর অবসর এ অর্থে নি'আমাত যে, সে চাইলে এতে অনেক ভাল কাজ আঞ্জাম দিয়ে লাভবান হতে পারে। অবশ্য এই ব্যস্ততা যদি হয় অন্যায় কাজে, আর এই অবসর যদি হয় কাজ কর্ম বাদ দিয়ে বিশ্রামের তাহলে ভিন্ন কথা।
তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, অত্যধিক ব্যস্ততা মানুষকে প্রয়োজনীয় অনেক কাজ থেকে অপারগ বানিয়ে দেয়। আর অবসর তাকে সচরাচর ধোকায় ফেলে থাকে। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই ভাববে যে, আমি কিসে ব্যস্ত হচ্ছি? যে কাজে আমি এত ব্যস্ত হচ্ছি তা আমার জন্য কতটুকু কল্যাণকর? আমার কি এতেই ব্যস্ত থাকা উচিত? নাকি অন্য কোন গুরু দায়িত্বে আমি অবহেলা করে ফেলছি। আর অবসর ব্যক্তিরও ভাবা উচিত যে, এই অবসরকে নিজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে না লাগালে পরে ব্যস্ততা এসে গেলে সেই কাজ করার আর কোন সুযোগই হয়ত পাব না। তাই অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক লাভজনক কাজে নিজের অবসর সময় কাটাবার পরিকল্পনা করাই বেশি

---

১০৮. সাহীহুল বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫১৪, হাদীস নং- ১৩৫১

www.pathagar.com

বুদ্ধিমানের কাজ। একজন মু'মিনের কাজের পরিকল্পনা কোন্ মুখী হবে তার বাস্তব নির্দেশনা আমরা নিচের হাদীসটিতে পাই।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ لَا شَيْءَ إلا أَنِّي أُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النبي صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ .

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক লোক নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললো যে, কিয়ামাত কবে হবে? তিনি বললেন: তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? লোকটি বললো: এর জন্য আমি কোন প্রস্তুতিই নিতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি যাদেরকে ভালবাস তাদের সাথেই থাকবে। আনাস (রা.) বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর এই কথায় (তুমি যাদেরকে ভালবাস তাদের সাথেই থাকবে) আমরা এত খুশী হয়েছি যে, আর কোন কিছুতে আমরা এত খুশী হইনি। আনাস (রা.) আরো বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, আবূ বাকর (রা.) এবং 'উমারকে (রা.) ভালবাসি। আর আশা করি যে, তাঁদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাঁদেরই সাথে থাকতে পারব। যদিও তাঁদের ন্যায় নেক আমল আমি করতে পারি না।[১০৯]

অতএব আমাদের উচিত নিজের সকল সুযোগ সুবিধাকে তাঁদের ভালবাসার পথে, তাঁদের আনুগত্যের পথে কাজে লাগানো।

(পাঁচ) মৃত্যু এসে যাওয়ার আগে জীবনকে: পৃথিবীতে মানুষের জন্য সর্বাধিক সত্য বিষয়টি হলো তার মৃত্যু। মৃত্যু ছাড়া আর কোন কিছুর কোন গ্যারান্টি নেই। অর্থাৎ মৃত্যুই একমাত্র অবধারিত সত্য। যে সত্যে লেশ মাত্র সন্দেহ নেই এবং যা হবেই হবে। পৃথিবীতে একটা মানব শিশুর জন্ম হতেও পারে আবার নাও হতে

---

১০৯. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৯, হাদীস নং- ৩৪৮৫

www.pathagar.com

পারে। মাতৃগর্ভ হতে শিশুটি জীবন নিয়ে ভূমিষ্ট হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু একবার যে জন্মেছে, সে মৃত্যু বরণ করবেই। কিন্তু কখন সেই চির সত্য মৃত্যু তাকে হানা দেবে তা কোন মাইবনু জানে না। এ কারণে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তার কাছে শেষ মুহূর্ত বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ .

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর মজা চাখতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। অবশেষে তোমরা আমারই কাছে ফিরে আসবে"।[১১০] মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

"আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, তোমাদের কারো মওত আসার আগেই তা থেকে তোমরা খরচ করো। মওতের সময় সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না, তাহলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে শামিল হতাম। অথচ যখন কারো (কাজ করার) সময় পুরা হয়ে যায় তখন আল্লাহ কখনো কোন লোককে আর সময় দেন না। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ এর খবর রাখেন"।[১১১]

এক আরবী কবির ভাষায়-

مَوْتُ كَأْسٍ كُلُّ نَاسٍ شَارِبُوْا * قَبْرُ بَيْتٍ كُلُّ نَاسٍ دَاخِلُوْا

অর্থাৎ মৃত্যু হলো এমন এক পেয়ালা যার স্বাদ প্রত্যেক মানুষকেই আস্বাদন করতে হবে। আর কবর হলো এমন এক বাড়ি যে বাড়িতে প্রত্যেক মানুষকেই প্রবেশ করতে হবে।

আরেক ফারসী কবি বলেন: "দূ চীজ আদমী রা কুশাদ যূরে যূর, একে আব দানা দেগার খাকে গূর"। অর্থাৎ দু'টো জিনিস মানুষকে অহর্নিশি ডাকতে থাকে। একটি হলো তার রিয্ক আর আরেকটি হলো তার কবরের মাটি।

---

১১০. আলকোরআন: সূরা আল আম্বিয়া, ২১:৩৫

১১১. আলকোরআন: সূরা আল মুনাফিকূন, ৬৩:১০-১১

www.pathagar.com

আলোচ্য হাদীসে তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু এসে যাওয়ার আগেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার আদেশ করেছেন।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

হাদীসে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি আরেকটির পরিপূরক। তবে শেষোক্তটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর মধ্যে অন্য সবগুলোই বিদ্যমান। কেননা মানুষের সুস্থতা-অসুস্থতা, ব্যস্ততা-অবসর, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা এবং যৌবন ও বার্ধক্য ইত্যাদি সবই তার জীবনেরই অংশ। সুতরাং মৃত্যু এসে যাওয়ার ব্যাপারে সজাগ থেকে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে যারা কাজে লাগায় তারা বাকী চারটি বিষয়কেও অধিক গুরুত্বই দিয়ে থাকে। সম্ভবত এজন্যেই কোন কোন বর্ণনায় এই পঞ্চম বিষয়টিকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ:حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ.

'আমর ইবনু মাইমূন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে (নাসীহাত করতে গিয়ে) বলেছেন: তুমি পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের আগে গুরুত্ব দিবে। (এক) মৃত্যু এসে যাওয়ার আগে তোমার জীবনকে। (দুই) ব্যস্ততা এসে যাওয়ার আগে তোমার অবসরকে। (তিন) দারিদ্রতা এসে যাওয়ার আগে তোমার সচ্ছলতাকে। (চার) বার্ধক্য এসে যাওয়ার আগে তোমার যৌবনকালকে। এবং (পাঁচ) অসুস্থতা এসে যাওয়ার আগে তোমার সুস্থতাকে।[১১২]

হাদীসের শিক্ষা:

- যৌবনই হলো পরকালীন সঞ্চয়ের সর্বোত্তম সময়। তাই যৌবনেই ভাল কাজে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত।
- যৌবনকে যারা আল্লাহর পথে কাটায় আল্লাহ তাদের অধিক পছন্দ করেন।

---

১১২. মূসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, খ. ৭, পৃ. ৭৭, হাদীস নং- ৩৪৩১৯

www.pathagar.com

- দুনিয়ার জীবনে সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য অবলম্বন করে আল্লাহর আনুগত্যে অটুট থাকা উচিত।
- সুস্থতা এবং অবসর এমন দু'টো গুরুত্বপূর্ণ নি'আমাত যা মানুষ সময়মত উপলব্ধি করে না। যারা এ দু'টো নি'আমাতকে যথাসময়ে উপলব্ধি করে তা কাজে লাগায় তারাই সফলকাম।
- দুনিয়ায় মানুষের চাওয়া পাওয়ার কোন শেষ নেই। সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা কেবল আপেক্ষিক বিষয়।
- বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যত ভাল হবে- এ গ্যারান্টি কারো কাছে নেই। তাই আরো অধিক সচ্ছলতা লাভের আশা ত্যাগ করে বর্তমান অবস্থাতেই সম্ভবমত কাজ করে ফেলা উচিত।
- মৃত্যু নামক চির সত্য বিষয়টি যে কোন মুহূর্তে এসে হানা দিতে পারে। আর তাই মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিত।
- সর্বাবস্থায় মৃত্যুর স্মরণই মানুষকে হতাশামুক্ত ও কর্মচঞ্চল রাখতে পারে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ হাদীসের আলোকে নিজেদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে পরকালীন সফলতার লক্ষ্যে তাঁর দাসত্বের পথে পরিচালিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১১

বেপর্দা ও অশ্লীলতার ভয়াবহ পরিণতি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ দুই দল (লোক) জাহান্নামের অধিবাসী। আমি তাদেরকে দেখিনি। তাদের এক দল হলো ঐ সম্প্রদায় যাদের সাথে গাভীর লেজের মত চাবুক রয়েছে। তা দিয়ে তারা মানুষদেরকে পিটায়। আরেক দল হলো ঐসব নারী, যারা পোশাক পরিহিতা অথচ উলঙ্গ, যারা হেলে দুলে চলে, যারা (মানুষদেরকে) আকৃষ্ট করে। তাদের মাথাগুলো উটের হেলে পড়া চুটের ন্যায় উঁচু, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এর গন্ধও পাবে না। যদিও এর সুগন্ধি এত এত দূর থেকেও পাওয়া যায়।[১১৩]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা

---

১১৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৬৮০, হাদীস নং- ২১২৮

www.pathagar.com

'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল-'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে অন্যায়ভাবে মানুষের প্রতি অত্যাচার করার কুফল এবং বেপর্দা ও বেপরোয়াভাবে চলাফেরাকারিনী নারীদের পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ক্ষমতার দণ্ড যাদের হাতে থাকে তারা যদি তা অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করে এবং নিরপরাধ মানুষেরা যদি তাদের আক্রমণের শিকার হয়, তাহলে এর দ্বারা সামাজিক শৃংখলা ব্যাহত হয়। সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়। আর যারা এরূপ অন্যায় আচরণ করে তারাও পরকালে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়। একইভাবে নারীদের অশালীন পোশাক ও অমার্জিত চলাফেরা সামাজিক শৃংখলা

www.pathagar.com

বিনষ্ট করে, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উঠে যায়, অন্যায় ও অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আর যারা এরূপ করে তাদের জন্যও পরকালে জাহান্নাম নিশ্চিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই আমাদেরকে এ দুই শ্রেণির মানুষের ব্যাপারে সাবধান করেছেন। তাদের কঠিন পরিণতির কথা বলে দিয়ে আমাদেরকেও এথেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছেন। দুনিয়ায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সৌহার্দপূর্ণ জীবন যাপনের পাশাপাশি পরকালীন নাজাতের জন্য তাই এই হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই শ্রেণির মানুষের কথা বলে তাদের বৈশিষ্ট্য ও করুণ পরিণতির ব্যাপারে ভবিষ্যতবাণী করেছেন। 'সিনফানে' শব্দটি 'সিনফুন' এর দ্বিবচন। আরবী 'সিনফুন' শব্দের অর্থ হলো- এক প্রকার বা এক ধরন বা এক শ্রেণি। আর সিনফানে হলো- দুই প্রকার বা দুই ধরন ইত্যাদি। অর্থাৎ দুইজন ব্যক্তি নয় বরং দুই ধরনের ব্যক্তিদের কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তিনি তাদেরকে দেখেননি। এথেকে বুঝা যায় যে, এটি একটি ভবিষ্যতবাণী। অর্থাৎ ভবিষ্যতে এরূপ দুই শ্রেণির মানুষের আবির্ভাব ঘটবে। তারা হলোঃ

এক. যাদের হাতে চাবুক রয়েছে। অর্থাৎ যাদের হাতে ক্ষমতা, দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষমতার দণ্ড বা প্রভাব-প্রতিপত্তিকে তারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। হাতে চাবুক থাকা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক একটি কথা। এর দ্বারা চাবুক, বন্দুক ও লাঠিয়াল বাহিনীও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার ক্ষমতার দণ্ড ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যাদের আছে তাদের কথাও বুঝানো হতে পারে। কেননা এগুলো প্রয়োগ করার কথা ছিল অত্যাচারি, অনাচারি, চোর-ডাকাত, লম্পট ও বখাটেদের শায়েস্তা করার জন্য। কিন্তু তা যদি নিরপরাধ মানুষ, নিরীহ পথচারী আর সাধারণ নাগরিকদের হয়রানির জন্য ব্যবহৃত হয়, কিংবা তাদেরকে হেনস্তা করার মাধ্যমে অবৈধ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলার পরিপন্থী। যারা এরূপ করবে তাদের শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

আজকাল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার পালাবদলে যখন যারা এই শাসনদণ্ডের অধিকারী হন, তারা তাদের প্রতিপক্ষকে অন্যায়ভাবে দমানোর চেষ্টা করেন। তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেন। নিজেদের অন্যায় ও অপকর্মের বিরোধিতা করলে তাদেরকে অন্যায়ভাবে শায়েস্তা করেন। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিরপরাধ মানুষকে পথে ঘাটে অপমানিত করেন। তাদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ এনে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে তটস্থ রাখেন। নিজেরা পরিকল্পিতভাবে কোন অঘটন ঘটিয়ে এর দায়ভার বিরোধীদের উপর চাপান ... ইত্যাদি। মূলতঃ এ সবই হাদীসে উল্লেখিত এই প্রথম শ্রেণির মধ্যে পড়ে।

দুই. ঐসব নারী যারা বাহ্যত পোশাক পরিহিতা হলেও তাদের পোশাকের অবস্থা এমন যে, তারা পোশাক পরেও যেন উলঙ্গ। তারা পরপুরুষদের সামনে এমনভাবে হেলে দুলে চলে যেন তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উটের চুট যেমন উপরের দিকে হেলে হেলে পড়ে, তাদের উলঙ্গ মাথাও তেমনি যেন চলার সময় পথিকদেরকে জানান দিয়ে যায়। এককথায় তারা হলো উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার এক উজ্জল প্রমাণ। হাদীসে এই যে দ্বিতীয় শ্রেণিটির কথা বলা হয়েছে তাও অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। কারণ আজকাল আমরা পোশাকের অশালীনতা ও বেলেল্লাপনার যত রকমারি দৃশ্য দেখতে পাই তা সবই এর অন্তর্ভূক্ত। পোশাকের রকমারি ফ্যাশনের নামে যে নতুন নতুন ডিজাইনের প্রবর্তন করা হচ্ছে তা একদিকে যেমন পোশাক পরেও উলঙ্গ থাকার শামিল, অপরদিকে তা অবলিলাক্রমে যুবসমাজকে ইভটিজিং সহ নানা অশ্লিলতার দিকে ধাবিত করছে। বর্তমান সময়ে মডেল তারকারা পরচুলা লাগিয়ে নেচে গেয়ে এবং নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে মানুষকে যেভাবে অন্যায়ের দিকে আকৃষ্ট করে তাও এরই মধ্যে শামিল। যৌন সুড়সুড়িদানকারী নাটক, সিনেমা ইত্যাদিও এই শ্রেণির বাইরে নয়। এমনকি বিজ্ঞাপনের নামে নারী-পুরুষদের উলঙ্গপনার যে নৃশংস থাবা গোটা সমাজে ছেয়ে আছে তা সবই নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সেই ভবিষ্যত বাণীরই বাস্তব নমূনা। কারণ তিনি বলেছেন যে, 'আমি এই দুই শ্রেণিকে দেখিনি'। অর্থাৎ তা ভবিষ্যতে ঘটবে।

আর তাদের পরিণতির কথা জানিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের কোন গন্ধও তারা পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এতই প্রকট যে, তা অনেক দূর থেকেই পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

হাদীসের শিক্ষা:

- ক্ষমতার অপব্যবহার করা মহান আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেককারী।
- অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলে আখ্যায়িত করাও অপরাধ।
- সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া অন্যায়।
- একজনের পাপের বোঝা আরেকজনের উপর চাপানো যায় না।
- স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে অঙ্গভঙ্গি করে হেলে দুলে চলা নারীদের জন্য নিষিদ্ধ।
- যে পোশাক অশ্লিলতার দিকে আহবান করে তা সকলের জন্যই পরিত্যাজ্য।
- শুধু পোশাকই নয়, চলার পথে আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গী থেকেও নারীদের সাবধান থাকা উচিত।
- পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত নীতিমালা মেনে চলা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জরুরী।
- সমাজের যে সকল লোক নারীদেরকে বিজ্ঞাপন সামগ্রী বানিয়ে অশ্লিলতা ছড়ায় তারাও সমান পাপী।
- জাহান্নামে নিক্ষেপকারী এসব আচরণ থেকে নিজেরা বেঁচে থাকা এবং নিজেদের পোষ্যদেরকে বাঁচানো আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ দুই শ্রেণির মানুষের অশালীন থাবা থেকে মুক্ত রাখুন। ফিতনা ফাসাদের এ যুগে নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের এ পথ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার তাওফীক দান করুন। তাঁর অফুরন্ত নি'আমাত দিয়ে তিনি আমাদেরকে সিক্ত করুন। তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ক্ষমা নসীব করুন। পরকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর অপার করুণায় জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১২

আল্লাহর পথে সময় অতিবাহিত করার গুরুত্ব

عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহর পথে (জিহাদে) একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সব কিছু থেকে উত্তম"। (মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।)[১১৪]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশিষ্ট খাদিম ও একনিষ্ঠ সহচর। আনাস তাঁর মূল নাম, আর উপনাম হলো আবূ হামযাহ ও আবূ সুমামা। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'হামযাহ' নামক এক প্রকার সবজি খুটতে দেখে আদর করে বলেন- 'ইয়া আবা হামযাহ'। সেই থেকে তাঁর ডাক নাম হয়ে যায় আবূ হামযাহ। তাঁর মাতা হলেন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী 'উম্মু সুলাইম বিনতু মিলহান' (রা.)। ইয়াসরিবের বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই গোত্রটিই ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আনাস (রা.) এর পিতা মালিক ইবনু নাদর এবং মাতা উম্মু সুলাইম সাহলা বিনতু মিলহান আলআনসারিয়্যাহ। উম্মু সুলাইম (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খালা হতেন।

---

১১৪. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১০২৮, হাদীস নং- ২৬৩৯ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৪৯৯, হাদীস নং- ১৮৮০

www.pathagar.com

আনাসের (রা.) এক চাচা আনাস ইবনু নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর দেহ কেটে কুটে বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আনাস (রা.) বলতেন: আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল।[১১৫] আনাসের (রা.) বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং কুফরী অবস্থায় সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তাঁর মা খাযরাজ গোত্রের বিত্তশালী ব্যক্তি আবূ তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। বালক আনাসকেও সাথে করে তিনি আবূ তালহার বাড়িতে নিয়ে যান। এবং সেখানেই তিনি লালিত পালিত হন।

আনাস (রা.) দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একান্ত সংস্পর্শে ছিলেন। ফলে অতি কাছে থেকে তাঁর অনেক কথা শুনা ও অনেক কাজ লক্ষ্য করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) নিজেই বলেন: আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন: 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী-পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালিগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে'। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্বপ্রথম আমাকে এই ওয়াসিয়াতটি করেন: ছেলে, তুমি আমার গোপন কথা গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি।

---

১১৫. সীরাতু ইবন হিশাম, খ. ২, পৃ. ৮৩

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর মৃত্যুর পর আনাস (রা.) তাঁর গোটা জীবন হাদীসের প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬ টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হাদীসের সংখ্যা ১৬৮ টি। বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আনাস (রা.) বলেন যে, দশ বছর বয়সে আমার মাতা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর খিদমাতে পাঠান। তখন থেকে দশ বছর ধরে আমি তাঁর খিদমাতে নিয়োজিত থাকি। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যখন ইন্তিকাল হয়, তখন আমার বয়স বিশ বছর। দ্বিতীয় খালীফাহ 'উমার (রা.) এর শাসনকালে তিনি বসরায় চলে যান এবং সেখানে দীনি 'ইলম শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকেন। অত:পর ৯১ হিজরীতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এবং তিনিই ছিলেন বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্ব:

আলোচ্য হাদীসে মহান আল্লাহর পথে সময় অতিবাহিত করার গুরুত্ব ও এর অপরিহার্যতা আলোচনা করা হয়েছে। আমরা মহান আল্লাহর দাস এবং তিনি আমাদের একমাত্র মনিব। মনিবের কাজ হলো দাসদেরকে আদেশ করা। আর দাসের কাজ হলো সেই আদেশমত চলা, সেই আদেশের যথাযথ বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহর পছন্দ হলো যে, বান্দাহ কেবল তাঁরই নির্দেশ মেনে চলুক অন্য কারো নয়। আর এর বিনিময়ে তিনি তার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন এমন মহা পুরষ্কার যা তার চোখ কখনো দেখেনি, তার কান কখনো শুনেনি। এমনকি সে তা কখনো কল্পনাও করেনি। এক হাদীসে কুদসীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم : قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ (فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

www.pathagar.com

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মহান আল্লাহ বলেছেন: আমি আমার নেককার বান্দাহদের জন্য (জান্নাতে এমন সুখ-সুবিধা) প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি। এমনকি কোন মানবের অন্তরও যা কখনো কল্পনা করেনি। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) তোমরা চাইলে (এ প্রসঙ্গে আলকোরআনের এ আয়াতটি) পড়: "কেউই জানেনা যে, তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কত কিছুই না প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তারা যে আমল করত তার প্রতিদান স্বরূপ"।[১১৬]

অথচ দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখ-সুবিধা ও ভোগ-বিলাসের মোহে মানুষ সর্বদাই থাকে আচ্ছন্ন। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, আখিরাতের কল্যাণ প্রাপ্তির আশায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এ জীবনের ক্ষুদ্র সময়টুকুও যদি কেউ বিলিয়ে দিতে পারে তাহলে তা তার জন্য গোটা দুনিয়া এবং এর মধ্যকার সকল নি'আমাতের চেয়েও উত্তম। এমনকি এ ক্ষুদ্র জীবনের কোন একটি অংশও যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর দীনের পথে ব্যয় করে তাহলে তার জন্যেও রয়েছে অনুরূপ মর্যাদা।

মহান আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে একজন মু'মিন তার ইহকালীন কল্যাণ লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে সে তার পরকালীন মুক্তিও নিশ্চিত করতে পারে। বিশেষ করে আল্লাহর দীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার যে নিরন্তর চেষ্টা ও পেরেশানী তা তাকে পরকালে মহান আল্লাহর কাছ থেকে এমন অফুরন্ত নি'আমাত লাভের যোগ্য করে দিতে পারে যা সে কখনো কল্পনাও করেনি। তাই একজন মু'মিনের জীবনে এই বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের মৌলিক কোন 'ইবাদাতের নাম বলেননি। শুধু বললেন 'আল্লাহর পথে (জিহাদে) একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সব কিছু থেকে উত্তম'।

---

১১৬. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১১৮৫, হাদীস নং- ৩০৭২

www.pathagar.com

অর্থাৎ সাধারণভাবে দুনিয়ার পুরো জীবনটাই মানুষ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চালাতে আদিষ্ট। তবে আল্লাহর পথে জিহাদের কাজে তার জীবনের একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল কাটানো অত্যন্ত মর্যাদাকর বিষয়। এর মাধ্যমে একদিকে জিহাদের সর্বাধিক গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। অপরদিকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর দীনকে বিজয়ী জীবনাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও পরিকল্পনা মাথায় রাখার আহবান জানানো হয়েছে। আর এক্ষেত্রে সকলেরই অল্প কিংবা বিস্তর সকল ভূমিকাই যে প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তাও বুঝানো হয়েছে।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদ ইসলামের একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। ঈমান আনার পর ঈমানের দাবী অনুযায়ী চলতে গিয়ে একজন মু'মিনের জীবনে যত ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কোরবানী পেশ করতে হয় তা সবই এই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ ঈমানী যিন্দিগীর যাবতীয় ত্যাগ-তিতীক্ষা ও কষ্ট-ক্লেশই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলে গণ্য।

হাদীসটিতে 'গাদওয়াতুন' এবং 'রাওহাতুন' এ শব্দ দু'টো ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাতকালের কিছু সময়কে বলা হয় 'গাদওয়া'। আর সান্ধ্যকালীন কিছু সময়কে বলা হয় 'রাওহা'। এ দু'টো শব্দই 'নাকিরাহ' বা অনির্দিষ্টবোধক। হাদীসটিতে শব্দ দু'টোর এরূপ ব্যবহার নি:সন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আর তা হলো- অনির্দিষ্ট বাচক এ শব্দ দু'টো ব্যবহার করে মূলত: দিনের যে কোন অংশের যে কোন পরিমাণ সময়কেই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দীনের পথের এ মেহনত যে কোন সময়ে এবং যে কোন পরিমাণই গুরুত্বপূর্ণ। তবে নিজের জীবন বাজি রেখে দীনের পথে পাহারাদারী করা অন্য যে কোন উপায়ে ভূমিকা রাখার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ দুনিয়ায় মহান আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে সে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের হেফাযত কল্পে গঠিত নিরাপত্তা কর্মীরাও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন অপরাপর বিভিন্ন বর্ণনা থেকেও তা বুঝা যায়। এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বর্ণনা নিম্নরূপ-

عن سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وما عليها وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ من الْجَنَّةِ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وما عليها وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو الْغَدْوَةُ خَيْرٌ من الدُّنْيَا وما عليها .

www.pathagar.com

সাহল ইবনু সা'দ আস সা'ইদী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: আল্লাহর পথে একদিন পাহারাদারী করা দুনিয়া এবং তার উপরকার সবকিছুর চেয়ে ভাল। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক রাখার জায়গাটিও দুনিয়া এবং তার উপরস্থ সবকিছুর চেয়ে ভাল। বিকেলে কিংবা সকালে কোন বান্দাহ যে আল্লাহর পথে বের হয় তাও দুনিয়া এবং তার উপরস্থ সবকিছুর চেয়ে ভাল।[১১৭]

عن سَلْمَانَ قال سمعت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ من صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عليه عَمَلُهُ الذي كان يَعْمَلُهُ وأجرى عليه رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ.

সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: এক রাত এবং এক দিন আল্লাহর দীনের পথে পাহারা দেয়া একমাস নফল রোযা রাখা ও নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর যদি সে এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাহলে যে কাজ সে করছিল তার প্রতিদান চলতেই থাকবে। তাকে অব্যাহতভাবে রিযিক দেয়া হবে এবং সে ফিতনায়ও পতিত হবে না।[১১৮]

একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমেই পৃথিবীময় শান্তি ও শৃংখলা নেমে আসা সম্ভব। এরপর এই শান্তিময় অবস্থাকে ধরে রাখতে এবং সর্বত্র তা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যে কাজটি করতে হয় তা হলো- মহান আল্লাহর পথে জিহাদ। ব্যক্তি জীবন কিংবা সমাজ জীবনে শান্তি-শৃংখলার পরিপন্থী যা কিছু বিরাজিত তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলারই অপর নাম হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। তাই এই জিহাদের কাজে প্রতিদিনই অল্প-বিস্তর সময় দান করা প্রত্যেক মু'মিনের কাছে তার ঈমানের দাবী। আল্লাহর পথের এই জিহাদই মু'মিনের আখিরাতে নাজাত ও দুনিয়ায় সফলতা প্রাপ্তির সোপান। কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর পথে জিহাদকারী হয় তখনই তার পক্ষে যাবতীয় প্রতিকূলতা মাড়িয়ে

---

১১৭. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১০৫৯, হাদীস নং- ২৭৩৫
১১৮. সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৫২০, হাদীস নং- ১৯১৩

www.pathagar.com

ইসলামের সকল বিধান অনুসরণ করে চলা সম্ভব হয়। তাই একজন মু'মিনের জীবনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

আল্লাহর পথে সকাল কিংবা সন্ধ্যা অতিবাহিত করার অর্থ:

আল্লাহর দীনের হেফাযত এবং এর প্রচার প্রসারের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকা একজন মু'মিনের নৈতিক দায়িত্ব। ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণের যে পথ সেটিই আল্লাহর পথ। একজন মু'মিন তার প্রতিটি পদক্ষেপেই চিন্তা ও চেষ্টা করে যে কিভাবে সে ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে। এ পথে তার যত সময় ব্যয় হয় তা সবই আল্লাহর পথে সময় ব্যয়। এ পথে তার যত অর্থ ব্যয় হয় তা সবই আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়। এ পথে তার যত মেধা ও শ্রম ব্যয় হয় তাও হয় আল্লাহরই পথে। ঈমান আনার পর তাই একজন মু'মিনের প্রধান দায়িত্ব হয়ে যায় ইসলামের বিধিবিধানগুলো মেনে চলা এবং অন্যকেও এই বিধানের দিকে আহবান করা। অত:পর সকলে মিলে এই বিধানগুলো বাস্ত বায়নের চেষ্টা করা। এই চেষ্টা করতে গিয়ে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হলে সকলে মিলেই তা প্রতিহত করা। আর এই কাজে মু'মিনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করাই হলো আল্লাহর পথে সময় অতিবাহিত করার অর্থ। পরিমাণের দিক দিয়ে সে সময় যত কমই হোক না কেন।

আলোচ্য হাদীসে বিশেষ করে ইসলামের দুশমনদের মুকাবিলায় এবং শত্রুপক্ষের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম বাহিনীর হেফাযত কল্পে যারা পাহারাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া সার্বক্ষণিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় যারা প্রহরীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাদেরকেও বুঝানো হয়েছে। তারা নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধার চেয়ে সর্বদাই ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়। এমনকি নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিসর্জন দিয়ে হলেও ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

আর এ কারণেই তাদের এ ত্যাগের কথাকে হাদীসে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম জনগণের হিফাযাত ও রক্ষণাবেক্ষণে যারা সকাল কিংবা সন্ধ্যায় সময় ব্যয় করেন তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে উপরিউক্ত মর্যাদা রয়েছে। এমনকি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে মহান আন্দোলন

www.pathagar.com

পরিচালিত হয়, সে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পাহারাদারীও আল্লাহর পথে সময় ব্যয় হিসেবে গণ্য।

হাদীসের শিক্ষা:

- আল্লাহর দীনের প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের যাবতীয় চেষ্টাকেই জিহাদ বলে।
- যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা ও মুজাহিদদের পাহারা দেয়া মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পছন্দনীয় কাজ।
- ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলগণ ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের হিফাযাতের লক্ষ্যে যে নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলা হয় তাতে অংশ গ্রহণও এই মর্যাদার অন্তর্ভূক্ত।
- দীনের পথে নিজের জান বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার পুরষ্কার দুনিয়ার যে কোন প্রাপ্তির চেয়ে অনেক বড়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের সকল মেধা, শ্রম ও অর্থ তাঁর দীনের বিজয়ের জন্য তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সপে দিয়ে সর্বদা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা দান করুন। আর এর ওসীলায় পরকালে আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিফল নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১৩

অন্যায় ও অপকর্ম রোধে মু'মিনের করণীয়

عن أَبِي سَعِيدٍ قال: سمعت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ যখন কোন অন্যায় দেখতে পায় তখন সে যেন তা তার হাত দিয়ে (বল প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন তার মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) তা প্রতিহত করে। যদি সে তাও করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে তা (অপছন্দ করে/ঘৃণা করে/তার মূলোৎপাটনের পরিকল্পনা করে) প্রতিহত করে। আর এটি (শেষোক্তটি) হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।[১১৯]

হাদীসটির বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আলোচ্য হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.)। তাঁর মূল নাম সা'দ, ডাক নাম আবূ সা'ঈদ। খুদরাহ বংশের সন্তান হওয়ার কারণে তাঁকে খুদারী বা খুদরী বলা হয়। তাঁর পিতা মালিক ইবনু সিনান আল-আনসারী আল-খুদরী উহুদ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ ছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হলে তিনি তাঁর পবিত্র খুন চুষে গিলে ফেলেন। রাসূল তখন মন্তব্য করেনঃ "আমার রক্ত যার রক্তে মিশেছে তাঁকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না"। ডাক নাম বা উপনামেই তিনি অধিক পরিচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নাবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই তাঁর জন্ম হয়।

---

১১৯. সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৬৯, হাদীস নং- ৪৯

www.pathagar.com

তাঁর মা উনাইসাহ বিনতু আবী হারিসাহ বানু 'আদী ইবনু নাজ্জারের কন্যা। তাঁর দাদা সিনান ছিলেন মহল্লার রাঈস। তিনি ছিলেন একটি কিল্লার অধিপতি ও ইসলাম পূর্ব যুগের একজন বিচারক। তাঁর মায়ের প্রথম স্বামী ছিল আউস গোত্রের 'আম্মান নামক এক ব্যক্তি। সে মারা যাওয়ার পর তিনি মালিক ইবনু সিনানকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁদেরই সন্তান আবূ সা'ঈদ হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ইয়াসরিবে জন্ম গ্রহণ করেন। বাই'আতে 'আকাবার সময় থেকে যখন মাদীনায় ইসলামের দা'ওয়াত চালু হয়, তখনই মালিক ইবনু সিনান মুসলিম হন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীও মুসলিম হন। সুতরাং আবূ সা'ঈদ মুসলিম মা-বাবার কোলেই বেড়ে উঠেন।

বালক আবূ সা'ঈদ মাসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। অল্প বয়সের কারণে বদর যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। যুদ্ধের পূর্বে তিনি পিতার সাথে রাসূলুল্লাহর নিকট যান। রাসূলুল্লাহ তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেন এবং এখনও যুদ্ধের বয়স হয়নি বলে ফিরিয়ে দেন। আবূ সা'ঈদের পিতা বেশি সম্পদশালী ছিলেন না। তাই পিতার মৃত্যুর পর তিনি পর্বত সমান বিপদের সম্মুখীন হন। একদিন প্রচন্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে আছেন। এমতাবস্থায় তাঁর স্ত্রী (মতান্তরে মা অথবা দাসী) তাঁকে বললেন: নাবীর কাছে যাও, তাঁর কাছে কিছু চাও। অমুক এসে সাহায্য চেয়েছিল, তিনি তাকে দিয়েছেন। আবূ সা'ঈদ বলেন: আমি যখন রাসূলুল্লাহর নিকট গেলাম তখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন: 'যে ব্যক্তি কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহও তাঁকে চাওয়া থেকে বিরত রাখবেন। আর যে নিজেকে গানী বা ধনী মনে করে আল্লাহও তাকে ধনবান করে দেন। আর যে আমার কাছে কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকে সে ঐ ব্যক্তির থেকেও আমার কাছে বেশি প্রিয় যে আমার কাছে চায়'। একথা শুনে আমি আর কিছু চাইলাম না। আমি বাড়ি ফিরে এলাম। অত:পর মহান আল্লাহ আমাদের রিযকে বরকত বা সমৃদ্ধি দান করতে লাগলেন। অবশেষে আনসারদের মধ্যে কোন বাড়ি আমাদের চেয়ে বেশি বিত্তশালী ছিল বলে আমার জানা ছিল না।

তিনি হাদীসের হাফিয এবং অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সমকালীন সাহাবীদের মধ্যে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ১১৭০। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর থেকে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হবার কথা উল্লেখ করেননি। এবং তারা তাঁকে অধিক বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যেও গণ্য করেননি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন এবং বিভিন্ন গাযওয়ায় তাঁর বেশ অবদান ছিল। তিনি মোট বারটি যুদ্ধে যোগ দেন বলে জানা যায়। ৭৪ হিজরী সালে ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মাদীনার মাসজিদে নাবাবীর নিকটবর্তী জান্নাতুল বাকী'-তে দাফন করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ
হাদীসটিতে অন্যায় ও অপকর্ম রোধে একজন মু'মিনের কী ভূমিকা হওয়া উচিত তা আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃংখলা নিশ্চিত করার জন্য শুধু নিজে সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়। বরং অন্যকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা অত্যন্ত জরুরী। কেননা অন্যদের অসততার মাঝে নিজেও সততার উপর টিকে থাকা যায় না। কোরআন এবং সুন্নাহয় তাই সৎ কাজ করতে যেমন বলা হয়েছে, অন্যকে সৎ কাজের আদেশ করতেও বলা হয়েছে। আবার অসৎ কাজ করতে যেমন বারণ করা হয়েছে, অন্যকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। আবার এটি শুধু ব্যক্তিগতভাবেই প্রত্যেকের দায়িত্ব নয়, বরং রাষ্ট্রীয়ভাবেও সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখাকে মুসলিম সরকারের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

"তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দেই, তাহলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে"।[১২০]
সমাজের অভ্যন্তরের প্রতিটি ব্যক্তি যখন অন্যায়ের প্রতিরোধে সোচ্চার হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেই যখন তা প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই

---

১২০. আলকোরআনঃ সূরা আল হাজ্জ, ২২:৪১

www.pathagar.com

অন্যায় এতটা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে না। আলোচ্য হাদীসে অন্যায় প্রতিরোধে প্রত্যেক মু'মিনের ন্যূনতম দায়িত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এ হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যাঃ

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের প্রত্যেককেই শামিল করে এমনভাবে নির্দেশ দিলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ যখনই কোন অন্যায় দেখতে পায় সে যেন তার সাধ্য অনুযায়ী তা প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। কেননা শাইতান এবং মানুষের প্রবৃত্তি সবসময়ই মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে। অন্যায় কাজকে তার সামনে লোভনীয় করে উপস্থাপন করে। অন্যায়ের পথকে তার জন্য সুগম করে। এমতাবস্থায় মানব সমাজকে স্থিতিশীল ও শান্তিময় করে রাখার জন্য সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আর তাই যুগে যুগে সকল উম্মাতদের মাঝেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ বিধান প্রবর্তিত ছিল। মুসলিম উম্মাহর জন্যও এ বিধানকে করা হয়েছে সর্বজনীন। বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য একে অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তবে এ হাদীস আমাদের সামনে পরিষ্কার করে দিলো যে, এই গুরু দায়িত্বটি কেবল সরকার প্রধানেরই নয়। বরং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের প্রত্যেক ব্যক্তি বড় কিংবা ছোট, ধনী কিংবা গরীব, নারী কিংবা পুরুষ সকলেরই এটি অন্যতম দায়িত্ব যে, সে তার অবস্থানে থেকে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী সমাজ থেকে অন্যায় ও অসৎ কার্যাদি মোকাবিলায় যেন সাধ্যমত ভূমিকা রাখে। একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজের কর্তাব্যক্তিরা যেভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্যায় প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারবে, একজন সাধারণ মু'মিন ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেরূপ ভূমিকা রাখতে পারবে না। আর তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসটিতে এই মহান দায়িত্বকে কয়েক স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ যার বেলায় যখন যেই স্তরটি প্রযোজ্য হয় সে যেন তখন সেই স্তরটি প্রয়োগ করে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করে।

হাদীসটিতে 'মান' (যে ব্যক্তি) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যা ব্যাপকার্থবোধক। এরপর 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) উল্লেখ করে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়,

www.pathagar.com

ধনী-গরীব সকলকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরপর 'মুনকার' শব্দটিকে 'নাকিরাহ' বা অনির্দিষ্টবাচক ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে তা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ যে কোন ধরনের অন্যায় দেখতে পেলে সে যেন অবশ্যই তা প্রতিহত করে। আর যেহেতু সকলের পক্ষে সব ধরনের অন্যায় প্রতিহত করা সম্ভবপর হবে না, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যায় প্রতিহত করতে গিয়ে কয়েকটি ধাপের উল্লেখ করেছেন। অন্যায়ের মাত্রা অনুযায়ী এবং অন্যায় প্রতিহতকারীর অবস্থার আলোকে এই ধাপগুলো যেন মেনে চলা হয়। অর্থাৎ যার জন্য যেখানে যে ধাপ প্রযোজ্য সে যেন সেখানে সে ধাপ প্রয়োগ করে। অন্যথায় কখনো কখনো তা হিতে বিপরীতও হয়ে দাঁড়াতে পারে অথবা সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে।

হাদীসটির শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আর এটি (শেষোক্তটি) হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা'- একথা বলে ইঙ্গিত দিলেন যে, যেখানে যে ধাপ প্রয়োগ করা জরুরী এবং যার যে ধাপ প্রয়োগের সক্ষমতা আছে সে তা প্রয়োগ না করা ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক ।

হাদীসটিতে কেন শুধু অন্যায় প্রতিহত করতে বলা হয়েছে?

এ হাদীসে কেবল অন্যায় প্রতিহত করতে বলা হয়েছে, কিন্তু নিজে অন্যায় না করার কথা বলা হয়নি। আসলে এটি বলারই অপেক্ষা রাখে না। কেননা নিজে অন্যায় করলে অন্যকে সেই অন্যায় থেকে বারণ করা যায় না। তাই এটি খুবই স্বাভাবিক যে, নিজেও কোন অন্যায় করা যাবে না এবং অন্যকেও অন্যায় করতে দেখলে তা প্রতিহত করতে হবে। একইভাবে নিজেও সৎ কাজ করতে হবে এবং অন্যকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কেননা সৎ কাজে মগ্ন থাকা অসৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকার একটি উপায় এবং সৎ কাজের আদেশ দেয়াও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার অন্যতম কৌশল। আলকোরআনের সূরা লুকমানেও এভাবেই এসেছে। নিজ পুত্রকে লুকমানের উপদেশ বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ .

www.pathagar.com

"হে প্রিয় বৎস! নামায কায়েম করো, ভালো কাজের হুকুম দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং যে বিপদই আসুক তাতে সবর করো। এ কথাগুলোর জন্য বড়ই তাগিদ করা হয়েছে"।[১২১]

অতএব, সৎ কাজ নিজেও করতে হবে, অপরকেও উৎসাহিত করতে হবে। আর অসৎ কাজ নিজেও করা যাবে না এবং অপরকেও তা থেকে বারণ করতে হবে।

পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অন্যায় থেকে বিরত রাখার গুরুত্বঃ

পরস্পরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা হলো মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। মহান আল্লাহ তাদেরকে মানবতার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানবতার কল্যাণ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হলো তাদেরকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অসৎ কাজে বারণ করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

"এখন তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মাত, যাদেরকে মানব জাতির হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ করো ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্যই তা ভালো ছিল। যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান"।[১২২]

মুসলিম উম্মাহর এটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যও যে, তারা নিজেরা সৎ কাজ করে এবং অন্যদেরকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর নিজেরা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখে। যখনই মুসলিম জনগোষ্ঠি তাদের এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে তখনই তাদের উপর নানারকম লাঞ্ছনা নেমে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ بن الْيَمَانِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أو لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ . قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

---

১২১. আলকোরআনঃ সূরা লুকমান, ৩১:১৭

১২২. আলকোরআনঃ সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১১০

www.pathagar.com

হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্য অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দান করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। অন্যথায় আমার এ আশংকা হয় যে, আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি আরোপ করবেন। অত:পর তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করলেও তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে না। (আবূ 'ঈসা বলেন: এটি হাসান হাদীস)।[১২৩]

বিশেষত: মন্দ থেকে পরস্পরকে বিরত না রাখার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে ভালো কাজের পরিবেশও নষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে যারা ভাল তারাও তাদের ভালো কাজের উপর টিকে থাকার সুযোগ হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে পূর্বেকার উম্মাতদের বিভৎস পরিণতির কথা জানিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ . كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ .

"বানী ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর দাউদ ও 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের মুখ দিয়ে লা'নত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলো ও সীমালঙ্ঘন করেছিলো। তারা একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বারণ করা বাদ দিয়েছিলো। এরা যা করছিলো তা বড়ই মন্দ"।[১২৪]

অতএব সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব সর্বাবস্থায় পালন করতে হবে। তাহলে মুসলিম হিসেবে তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যও ঠিক থাকবে এবং পরস্পরের হকও আদায় করা হবে।

হাদীসটির শিক্ষা:

১. অপর মু'মিন ভাইয়ের কল্যাণকামী হতে হবে এবং তাকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে।

২. সৎ কাজ নিজেও করতে হবে, অপরকেও উৎসাহিত করতে হবে। আর অসৎ কাজ নিজেও করা যাবে না এবং অপরকেও করতে দেয়া যাবে না।

---

১২৩. সুনান আত তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮, হাদীস নং- ২১৬৯

১২৪. আলকোরআন: সূরা আল মায়িদাহ, ৫:৭৮-৭৯

www.pathagar.com

৩. মানুষ মাত্রই দায়িত্বশীল। দায়িত্বের পরিধি কম বেশি হলেও কেউই দায়িত্ব মুক্ত নয়।
৪. যিনি যত বড় দায়িত্বে নিয়োজিত তার জবাবদিহিও তত বেশি।
৫. সৎ কাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব সর্বাবস্থায় পালন করলে মুসলিম হিসেবে জাতিগত বৈশিষ্ট্যও ঠিক থাকবে এবং পরস্পরের হকও আদায় করা হবে।
৬. মুসলিম উম্মাহর এটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যও যে, তারা নিজেরা সৎ কাজ করে এবং অন্যদেরকেও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আর নিজেরা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখে।
৭. মুসলিম জনগোষ্ঠি যখন তাদের এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে তখনই তাদের উপর নানারকম লাঞ্ছনা নেমে আসে।
৮. অন্যায় প্রতিহত করণে যার যে ধাপ প্রয়োগের সক্ষমতা আছে সে তা প্রয়োগ না করা ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক ।
৯. ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় প্রতিহত করণ মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের এক অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হিসেবে গণ্য।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সদা সত্য ও ন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার তাওফীক দিন এবং অন্যকেও সত্য ও ন্যায়ের পথে ডাকার যোগ্যতা দান করুন। নিজেকে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখার এবং অন্যকেও তা থেকে বিরত রাখার তাওফীক দিন। নিজের জন্য যা পছন্দ করি অপরের জন্যও তা পছন্দ করার মানসিকতা দিন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১৪

দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহীতা

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ على أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ .

সরল অনুবাদঃ

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই একজন রাখাল (তত্ত্বাবধায়ক/অভিভাবক/দায়িত্বশীল) এবং তোমরা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে। যিনি ইমাম বা শাসক তিনি অভিভাবক/দায়িত্বশীল, তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন পুরুষ তার পরিবারবর্গের উপর দায়িত্বশীল এবং তিনি (তার দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন নারীও তেমনি তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীলা (রক্ষক) এবং তিনিও (তার দায়িত্বের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবেন। দাসও তার মনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেও জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব খবরদার! তোমরা সকলেই (নিজ নিজ জায়গায়) দায়িত্বশীল এবং তোমরা সকলেই (নিজের অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে।[১২৫]

---

১২৫. সাহীহুল বুখারী, (বাবু হুসনিল মু'আশারা মা'আল আহল) খ. ৫, পৃ. ১৯৮৮, হাদীস নং- ৪৮৯২

www.pathagar.com

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

নাম 'আব্দুল্লাহ, কুনিয়াত আবূ 'আবদির রহমান। পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব এবং মাতা যাইনাব। এক বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নাবূওয়াত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালেই তাঁর পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সের কারণে বদর যুদ্ধে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। তিনি ওহুদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কিনা এ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। তবে খন্দক থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি শরীক ছিলেন। সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী তৃতীয় সনে যখন উহুদ যুদ্ধ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এ হিসেবে নাবূওয়াতের দ্বিতীয় বছরে তাঁর জন্ম। নাবূওয়াতের ষষ্ঠ বছর তাঁর বাবা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন 'আব্দুল্লাহর বয়স প্রায় পাঁচ।

বাল্যকাল থেকেই 'আব্দুল্লাহ নিজেদের বাড়িটি ইসলামের আলোকে আলোকিত দেখতে পান। ফলে ইসলামী পরিবেশেই তিনি বড় হন। কোন কোন বর্ণনা মতে, পিতার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সঠিক কথা হলো পিতার ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি অতি অল্প বয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হিসেবে তিনিও তাঁর পিতার ধর্মানুসারী হয়ে যান। বাল্যকালেই তিনি পিতামাতার সাথে মাদীনায় হিজরাত করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সফরসঙ্গী ছিলেন এবং তিনি বাই'আতুর রিদওয়ানেও অংশগ্রহণ করেন।

মাক্কা বিজয়ের সময় ইবনু 'উমার ছিলেন বিশ বছরের নওজোয়ান। এ অভিযানে তিনি অন্য মুজাহিদদের পাশাপাশি ছিলেন। মাক্কা বিজয়ের পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর পেছনে পেছনে পবিত্র কা'বায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাথে সর্বপ্রথম উসামাহ ইবনু যায়িদ, 'উসমান ইবনু তালহা ও বিলাল ইবনু রাবাহ প্রবেশ করেন। তারপর আমিই প্রথম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। পরবর্তীতে হুনাইন অভিযান এবং তায়িফ অবরোধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সঙ্গী হয়ে তিনি পবিত্র হাজ্জ আদায় করেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন। অত্যন্ত বিচক্ষণ, মেধাবী ও

www.pathagar.com

তাকওয়াবান সাহাবী ছিলেন তিনি। সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়। এজন্যেই হাজ্জাজের ন্যায় কঠোর খলিফার নিকটও তিনি সত্য কথা বলতে দ্বিধা করেননি। খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে তিনি সবসময় পিছিয়ে ছিলেন এবং সর্বদাই 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। জাবির (রা.) বলেনঃ 'আমাদের মধ্যে ইবনু 'উমার ছাড়া আর কেউ নেই যে দুনিয়ার প্রতি কিছু না কিছু আসক্ত হয়নি'। নাফি' (রা.) বলেনঃ 'মৃত্যু পর্যন্ত ইবনু 'উমার (রা.) এক শতাধিক গোলামকে আযাদ করে যান'। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে তাকওয়ার ভাবটি গালিব ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই তাকওয়ার স্বভাব দেখে বলেছিলেন, 'রাজুলুস সালিহ - নেককার বান্দা'।

বয়োপ্রাপ্ত হবার পর থেকেই তিনি সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সার্বিক সহযোগী ছিলেন। তাই 'ইলমে হাদীসের চর্চা ও প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদান ছিল। এ ব্যাপারে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতিটি সুন্নাতের পূংখানুপূংখ অনুকরণের ব্যাপারে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি একজন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬৩০ মতান্তরে ১৬৩০ টি। এর মধ্যে ১৭০ টি মুত্তাফাকুন 'আলাইহি অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ৮১টি ইমাম বুখারী ও ৩১টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি ৭৩ অথবা ৭৪ হিজরী মোতাবেক ৬৯২/৬৯৩ খৃষ্টাব্দে পবিত্র মাক্কায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৩/৮৪ বৎসর।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহীতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সমাজের সদস্য হিসেবে নারী-পুরুষ আর ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সকলেরই কোন না কোন দায়িত্ব রয়েছে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এক্ষেত্রে মনিব আর কৃতদাসেও কোন পার্থক্য নেই। যার দায়িত্ব যত বেশি তার মর্যাদাও তত বেশি। আবার যার মর্যাদা যত বেশি তার জবাবদিহীতার পরিধিও তত বেশি। এ হলো ইহকালীন দায়িত্ব ও পরকালীন জবাবদিহীতা। তবে পরকালীন জবাবদিহীতা ছাড়াও প্রতিটি মানুষই যেমন তার অধীনস্তের উপর

www.pathagar.com

দায়িত্বশীল, তেমনি সে তার উর্ধ্বতনের কাছে দায়বদ্ধ। এই দায়িত্বশীলতা এবং দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়েই মানুষেরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করল কি করল না তা সে কিয়ামাতের দিন স্বচক্ষে দেখতে পাবে। মহাগ্রন্থ আলকোরআনেও একথারই প্রতিধ্বনি মিলে। ইরশাদ হয়েছে:

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً. اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً.

"প্রতিটি মানুষের ভালো ও মন্দ আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি। আর কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য একটা লেখা বের করবো, যা সে খোলা কিতাব হিসেবে পাবে। (তাকে বলা হবে) তোমার আমলনামা পড়ো। আজ তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট"।[১২৬]

যেহেতু মানব সমাজে সকলকেই কোন না কোন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়, যার যার দায়িত্বের ব্যাপারে সকলকেই জিজ্ঞাসিত হতে হবে। যার দায়িত্ব যত বেশি তার জবাবদিহীতাও তত বেশি। তাই মানব সমাজের কেউই দায়িত্বমুক্ত নয়। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যদি এই অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাহলে সকলেই হবে দায়িত্বপরায়ন এবং পরস্পরের সহযোগী। ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠবে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ। তাই আমাদের সমাজ জীবনে এই হাদীসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটির শুরুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- তোমরা সকলেই রাখাল। আরবী (রা'ঈ) শব্দটির অর্থ হলো রাখাল বা যে দেখাশুনা করে। এখান থেকেই কোন রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণ বা জনগণকে আরবীতে বলা হয় (رَعِيَّة) 'রা'ইয়্যাহ' বা যাদের দেখাশুনা করা হয়। এখানে তোমরা সকলেই বলতে নারী-পুরুষ এবং ছোট-বড় সকলকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই যার যার জায়গায় নিজের অধীনস্তের ব্যাপারে রাখালের ভূমিকা পালন করবে। একজন রাখাল যেমনি তার পালের সবগুলো পশুর খোঁজ খবর রাখে, তাদের সুবিধা অসুবিধা দেখে, তাদের প্রতি যত্নবান হয় এবং তাদেরকে সবসময় আগলে রাখে।

---

১২৬. আলকোরআন: সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭:১৩-১৪

www.pathagar.com

তেমনিভাবে প্রতিটি মানুষ যেন তার অধীনস্তদের প্রতি যত্নবান হয়, তাদের সুখ ও কল্যাণ বিধানে যেন সদা তৎপর থাকে। তাদের কোন প্রকার অকল্যাণ ও অনিষ্ট যেন সে নিজেও না করে এবং অন্যকেও করার সুযোগ না দেয়। এখানে তাই রাখাল শব্দটির প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, নারী-পুরুষ এবং ছোট-বড় সকলকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

হাদীসটির শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাধারণ ঘোষণা দেয়ার পর এক এক করে কয়েক শ্রেণির লোকের কথা আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাতে বুঝা যায় যে, দায়িত্বপালন ও জবাবদিহীতায় সকলেই সমানভাবে অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া এও বুঝা যায় যে, এদিক থেকে উল্লেখিত কয়েক শ্রেণির লোকেরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে ইমাম বা নেতার কথা। তিনি রাষ্ট্রের ইমাম বা শাসকও হতে পারেন, আবার স্থানীয় কোন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি কিংবা কোন ধর্মীয় নেতাও হতে পারেন। এরপর বলা হয়েছে পুরুষের কথা। অর্থাৎ একজন পুরুষ তিনি তার প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ছাড়াও নিজ পরিবারের দায়িত্বশীল। তারপর বলা হয়েছে নারীদের কথা। অর্থাৎ একজন নারী তার অন্য সব দায়িত্ব ছাড়াও নিজের স্বামীর পরিবারের দেখাশুনা এবং সন্তান-সন্ততিদের ব্যাপারে দায়িত্বশীলা। এখানে পুরুষের দায়িত্বের ব্যাপকতা এবং নারীর উপর তার কর্তৃত্বের কথাও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অত:পর বলা হয়েছে দাসের কথা। অর্থাৎ একজন দাসও দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। সে তার মনিবের পক্ষ থেকে যে দায়িত্বপ্রাপ্ত তার ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। একইভাবে মহান আল্লাহর দাস হিসেবে আমরা সকলেই তাঁর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবো। হাদীসটিতে শাসক শ্রেণি, পুরুষ, নারী এবং দাসের কথা উল্লেখের মাধ্যমে মূলত: সকল শ্রেণি ও পেশার লোকদের কথা বুঝানোই উদ্দেশ্য।

আর সকল মানুষই যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই দায়িত্ব পালনের অনুভূতিও মহান আল্লাহই তার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই সৃষ্টি করে দেন। তাই তাকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব না দেয়া হলেও অনেক সময় নিজ থেকেই সে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতে শুরু করে দেয়। যেমন যে শিশুটা দু'দিন আগেও নামাযের সামনে দিয়ে হাটাহাটি করত। বেশ কয়েকবার তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর সে এখন আর তা করে না। তার অনুজ শিশুটি যখন তার সামনে ঐ একই ভুল করে তখন সে কিন্তু

www.pathagar.com

আপনা থেকেই তাকে বলে যে, 'ভাইয়া! নামাযের সামনে দিয়ে যেতে হয় না'। তার মায়ের ফেলে আসা আংটিটি, কিংবা বাবার ভুলে যাওয়া চশমাটি সে যত্ন করে রেখে দেয় এবং তাদেরকে পৌঁছাবার ব্যবস্থা নেয়। অথচ এসব দায়িত্ব তাকে কখনই কেউ দেয়নি। এভাবে বিবেক-বুদ্ধি ও দায়িত্বানুভূতি প্রদানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ সকল মানুষকেই কোন না কোন দায়িত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থাৎ যে মনে করে যে তাকে কোন দায়িত্বই দেয়া হয়নি, সেও আসলে দায়িত্বমুক্ত নয়।

রাখাল বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

একজন রাখাল যেহেতু তার পালের পশুদের তত্ত্বাবধান করে ও তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে, তাই বাংলায় আমরা একে তত্ত্বাবধায়ক বা দায়িত্বশীলও বলতে পারি। একজন তত্ত্বাবধায়ক তার অধীনস্তদের লালন পালন ও সংশোধনের দায়িত্বশীল। তাদেরকে সঠিক পথে রাখা ও বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করা তার দায়িত্ব। তাই হাদীসটিতে রাখাল বলতে এই তত্ত্বাবধান ও দায়িত্বের কথাই বুঝানো হয়েছে। নেতা বা দায়িত্বশীল যদি তার অধীনস্তদের সংশোধন ও সংরক্ষণের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে বিপথগামী হবার অবাধ সুযোগ দিয়ে দেয়, তবে মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন সে জন্য তার কাছে কৈফিয়ত তলব করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর অন্যান্য হাদীসেও একথার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بن يَسَارٍ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ فقال له مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা.) এর শশ্রুষা করতে তার নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় 'উবাইদুল্লাহ (রা.) আমাদের নিকট প্রবেশ করল। মা'কিল তখন তাকে বললেন: আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বলবো যেটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি মুসলিমদের সামষ্টিক জীবনের দায়িত্বশীল হয়

www.pathagar.com

এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন।[১২৭] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الرحمن بن معقل بن يسار عَنْ أبيه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: أَيُّمَا وَالٍ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ كَنُصْحِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ.

'আব্দুর রহমান ইবনু মা'কিল ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুসলিমদের কোন ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে যদি তাদেরকে সেভাবে সদোপদেশ না দেয় যেভাবে দেয় নিজেকে/নিজের লোকদেরকে এবং তাদের কল্যাণে সেভাবে চেষ্টা না করে যেভাবে সে নিজের জন্য করে থাকে, তাহলে কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ তার চেহারাকে অধোমুখী করে আগুনের উপর নিক্ষেপ করবেন।[১২৮]

ইবনু 'আব্বাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে: "অথচ সে নিজেকে ও নিজের পরিবার পরিজনকে যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেভাবে তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করে না"। (তাবারানী, কিতাবুল খারাজ)

অতএব আমাদের প্রত্যেককেই যার যার স্থলে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। আমাদের প্রভূ মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে ব্যাপারে সবসময় সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

- মানুষ মাত্রই দায়িত্বশীল। দায়িত্বের পরিধি কম বেশি হলেও কেউই দায়িত্ব মুক্ত নয়।
- যিনি যত বড় দায়িত্বে নিয়োজিত তার জবাবদিহীতাও তত বেশি।
- প্রত্যেকেই তার অধস্তনদের উপর দায়িত্বশীল এবং উর্ধতনগণ তার উপর দায়িত্বশীল।
- ইসলামের দৃষ্টিতে দায়িত্বে অবহেলার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

---

১২৭. সাহীহুল বুখারী, খ. ৬, পৃ. ২৬১৪, হাদীস নং- ৬৭৩২

১২৮. আল মু'জামুস সাগীর, খ. ১, পৃ. ২৮২, হাদীস নং- ৪৬৫

www.pathagar.com

- পুরুষ হলো পরিবারের মূল কর্তা। আর নারী হলো পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।
- দাস যেমন তার মনিবের সম্পদ দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত, প্রতিটি মানুষও তেমনি নিজের প্রভূ মহান আল্লাহর দেয়া বিভিন্ন আমানাত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত।
- আপন দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক মু'মিনের কাছে তার ঈমানের দাবী।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিজ নিজ জায়গায় যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরকালের জবাবদিহীতাকে সহজ করে দিন। আমাদের যোগ্যতাকে তিনি বাড়িয়ে দিন। তাঁর অফুরন্ত নি'আমাত দিয়ে তিনি আমাদেরকে সিক্ত করুন। তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ক্ষমা নসীব করুন। পরকালে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর অপার করুণায় জান্নাত নসীব করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

---

www.pathagar.com

হাদীস নং- ১৫

কনে নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

হাদীসটির সরল অনুবাদঃ

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ কোন মহিলাকে (সচরাচর) চারটি গুণ দেখে বিয়ে করা হয়। (এক) তার ধন-সম্পদ, (দুই) তার বংশ-মর্যাদা, (তিন) তার সৌন্দর্য এবং (চার) তার দীন। তবে তুমি দীনদার মহিলা দেখে বিয়ে করবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১২৯]

রাবী/বর্ণনাকারীর পরিচয়ঃ

আবূ হুরাইরাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর একজন প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। আবূ হুরাইরাহ (রা.) এর নাম নিয়ে প্রকট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রসিদ্ধ কথা হলো এই যে, ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদি শামস বা 'আবদি 'আমর। আর ইসলাম গ্রহণের পর হয়েছে 'আবদুল্লাহ বা 'আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিল কারো কারো মতে যুখর, আর কারো কারো মতে গানাম। আবূ হুরাইরাহ তাঁর উপনাম। মূল নামের চেয়ে এই উপনামেই তিনি

---

১২৯. সাহীহুল বুখারী, খ. ৫, পৃ. ১৯৫৮, হাদীস নং- ৪৮০২

www.pathagar.com

অধিক খ্যাত। কথিত আছে যে, তিনি আদর করে একটি বিড়াল ছানা পুষতেন। একদা রাসূলের সামনে বসা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চাদরের ভেতর থেকে বিড়াল ছানাটি বেরিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে রসিকতা করে 'আবূ হুরাইরাহ' বা 'বিড়াল ছানার বাবা' বলে ডাকেন। আর সেই থেকে তিনি সকলের মাঝে আবূ হুরাইরাহ নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ হুরাইরাহ (রা.) সব সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্যে কাটাতেন এবং ছায়ার ন্যায় তাঁকে অনুসরন করতেন। এজন্যে অল্প কয়েক বছর রাসূলের সাহচর্যে থাকা সত্বেও তিনি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাধিক অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাছাড়া প্রশাসনিক কোন দায়দায়িত্ব না থাকার কারণে তিনি কেবল হাদীস চর্চায় একান্তে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আল 'আসকালানীর মতে, তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিযে হাদীস ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, প্রায় ৮০০ সাহাবী এবং তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে জাবির (রা.), ইবনু 'আব্বাস (রা.), আসমা (রা.) এবং ইবনু 'উমার (রা.) প্রমুখ সাহাবী রয়েছেন। হিজরী ৫৭ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও এর গুরুত্বঃ

হাদীসটিতে বিয়ের জন্য কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব গুণ বিবেচনায় আনা দরকার তা আলোকপাত করা হয়েছে। বিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে একটি পবিত্রতম সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। এই সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী কোন সম্পর্ক নয়। এটি একটি চিরস্থায়ী সম্পর্ক। এবং এ সম্পর্ক শুধু তাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দু'জনকে কেন্দ্র করে দু'টি বিশাল জনগোষ্ঠি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর বংশানুক্রমিকভাবে এ বন্ধনের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ বন্ধনের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা মানবকুলের মাঝে আত্মীয়তার দু'টি ধারা চালু করে দেন আর পরস্পরের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً .

www.pathagar.com

"তিনি ঐ সত্ত্বা, যিনি পানি থেকে একটি মানুষ পয়দা করেছেন। তারপর এ থেকে একটি বংশগত ও অপরটি শ্বশুর পক্ষ- এ দু'টো আত্মীয়তার ধারা সৃষ্টি করেছেন। আপনার রব বড়ই শক্তিশালী"।[১৩০]

বৈবাহিক সম্পর্ক একটি পবিত্র সম্পর্ক। এর মাধ্যমেই মহান আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের বংশ বিস্তার চান। তাই তিনি আমাদেরকে নেক সন্তান প্রত্যাশা করতে বলেছেন এবং তাদের সমন্বয়ে ঈমানদার ও মুত্তাকীদের সমাজ গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। আর এ লক্ষ্যেই তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে এভাবে দু'আ করতে শিখিয়েছেন:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً .

"(রাহমানের বান্দা হলো তারা) যারা দু'আ করে বলতে থাকে যে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে এমন বানাও, যেন আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী করো"।[১৩১]

বৈবাহিক সম্পর্কের প্রভাব বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে বলেই ইসলাম এ সম্পর্ক গড়ার আগে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে পরস্পরকে নির্বাচনের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে ভুল হলে সারা জীবনই এর মাশুল গুনতে হয়। আর সঠিক সিদ্ধান্তের সুফলও তেমনি সারা জীবন উপভোগ করা যায়। ইসলাম বর ও কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং বিবেচ্য বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো এবং এর মধ্যে কোন্ বিষয়টি অধিকতর বিবেচনার যোগ্য তা জানতে পারি। তাই মানব জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসটির ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমত: কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত বিবেচ্য বিষয়গুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর তিনি এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানুষেরা সচরাচর কোন নারীকে বিয়ের জন্য চিন্তা করলে তার মধ্যে চারটি গুণ

---

১৩০. আলকোরআন: সূরা আল ফুরকান, ২৫:৫৪

১৩১. আলকোরআন: সূরা আল ফুরকান, ২৫:৭৪

www.pathagar.com

বিবেচনা করে। তন্মধ্যে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হয় তার ধন-সম্পদ, এরপর বিবেচ্য বিষয় হয় তার বংশ মর্যাদা এবং এরপর হয় তার দৈহিক সৌন্দর্য। আর সবশেষে বিবেচনা করে তার দীনদারী তথা ধার্মিকতাকে।[১৩২] এ হলো সমাজে প্রচলিত কনে নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়াদি। এভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিবেচ্য বিষয়কে অনুমোদন করলেন। এরপর তিনি তাঁর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে বললেন: সমাজে প্রচলিত এসব বিষয় বিবেচনা করতে দোষের কিছু নেই। তবে যে বিষয়টিকে সাধারণত মানুষেরা সকলের শেষে বিবেচনা করে তুমি সেটিকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করবে। তাহলে তোমার বৈবাহিক জীবন সুখের হবে। অন্যথায় তা হবে ধুলায় ধুসরিত।

এভাবে বলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কনে নির্বাচনে দীনদারীর গুরুত্ব এবং একে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন। আর দীনদারীর বিষয়কে কম গুরুত্ব দিয়ে অন্যান্য গুণাগুণকে প্রাধান্য দেয়ার পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেই সাথে অন্যান্য যোগ্যতাগুলোও যে গুরুত্বপূর্ণ এবং তা বিবেচনা করা যাবে সেকথাও জানিয়ে দিলেন।

কনে নির্বাচনে দীনদারীকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণ:

স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর জন্য প্রশান্তির উৎস, তার জীবনসঙ্গিনী, বাড়ির গিন্নী, সন্তানদের মা ও পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সন্তানেরা তার কাছ থেকেই সৎ গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হয়, তার কোলেই পরম স্নেহের আবেশে বেড়ে উঠে। তার আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা ইত্যাদি সন্তানদের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই একজন দীনদার, সৎ ও চরিত্রবান স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং তাকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আখ্যায়িত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عن عبد الله بن عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .

---

১৩২. কোন কোন বর্ণনায় প্রথম তিনটি বিষয় আগে পিছে এসেছে। তবে চতুর্থটি সকল বর্ণনায়ই চার নাম্বারে এসেছে।

www.pathagar.com

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: সমগ্র পৃথিবীটাই হলো সম্পদ। আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী।[১৩৩] আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেককার স্ত্রীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

خَيْرُ النِّسَاءِ اِمْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِيْ مَالِهَا وَنَفْسِهَا .

সবচেয়ে উত্তম নারী সেই যার দিকে তুমি দেখলে তোমাকে খুশী করতে পারে, আদেশ করলে তোমাকে মান্য করে এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তার নিজের এবং সম্পদের ব্যাপারে তোমাকে হেফাযত করে।[১৩৪]

তাছাড়া যে চারটি গুণের কথা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোর মধ্যে দীনদারীর প্রাধান্য না থাকলে অন্যান্য গুণগুলো নিজের মধ্যে স্বামীর তুলনায় বেশি থাকার কারণে একজন নারী তার স্বামীর অবাধ্য হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেমন স্ত্রী যদি স্বামীর তুলনায় অনেক বেশি সুন্দরী হয় অথচ সে যদি পর্যাপ্ত দীনদার না হয়, তাহলে কোন একদিন হয়ত তার এই অধিক সৌন্দর্যই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। আবার সে যদি স্বামীর তুলনায় অনেক বেশি সম্পদশালী কিংবা বংশমর্যাদা সম্পন্না হয় অথচ পর্যাপ্ত দীনদার না হয়, তাহলে তার এই সম্পদ এবং বংশগরীমাই একদিন তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্টের জন্য কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু সে যদি পর্যাপ্ত দীনদার হয় তাহলে অন্যান্য গুণে স্বামীর চেয়ে এগিয়ে থাকলেও সে স্বামীর অবাধ্য হবে না এবং অহংকারে লিপ্ত হবে না। ফলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক হবে মধুর। সম্ভবত এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কনে নির্বাচনে দীনদারীকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। অন্যথায় বৈবাহিক জীবনে অসুখী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

---

১৩৩. সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১০৯০, হাদীস নং- ১৪৬৭

১৩৪. কানযুল 'উম্মাল, খ. ১৬, পৃ. ১২০, হাদীস নং- ৪৪৪৭৭

www.pathagar.com

দীনদারীর বিষয়টি কি শুধু কনের বেলায়ই লক্ষ্যনীয়?

বিয়ের ক্ষেত্রে দীনদারীর বিষয়টি শুধু কনের বেলায়ই লক্ষণীয় নয়। বরং এটি বর নির্বাচনের বেলায়ও তেমনি গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখা দরকার। আমাদের সমাজের কতক পুরুষদের মধ্যে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তা হলো- তারা নিজেরা নামায না পড়লেও চায় যে, তার বউটা যেন অবশ্যই নামাযী হয়। সে নিজে পর্দা মেনে না চললেও চায় যে, তার বউটা যেন অবশ্যই পর্দা মেনে চলে। কিন্তু তার এই চাওয়াটা মোটেও যুক্তিসংগত নয়। কেননা নারী ও পুরুষের মধ্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে পুরুষের হাতে। এই কর্তা যদি বেদীন হয় তাহলে তার অধীনস্থ লোকেরা চাইলেও দীনদার থাকতে পারবে না। কর্তা/নেতার আদর্শেই অধীনস্তরা আদর্শবান হয়ে থাকে। এ কারণে ঘরের কর্তৃত্বে থাকা সে পুরুষটির দীনদার হওয়া আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কনের অভিভাবকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوْهُ . إِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ.

তোমাদের কাছে যদি এমন কোন পাত্র (তোমাদের কনের জন্য) বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তোমরা তার সাথে তোমাদের কনেকে বিয়ে দাও। আর তা না করলে দুনিয়া ফিতনা-ফাসাদে ভরে যাবে।[১৩৫]

অতএব বর এবং কনে উভয়ের নির্বাচনের বেলায়ই দীনদারীকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। বরং অন্য সব গুণাগুণের ক্ষেত্রেও তাদের উভয়েরই কাছাকাছি মানের হওয়া উত্তম।

হাদীসের শিক্ষা:

- বিবাহের ক্ষেত্রে দৈহিক সৌন্দর্য, আর্থিক সঙ্গতি ও সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করা নিষিদ্ধ নয়।
- তবে দীনদারী অন্যসব গুণের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বের দাবী রাখে।

---

১৩৫. সুনানুল বাইহাকী আল কুবরা, খ. ৭, পৃ. ৮২, হাদীস নং- ১৩২৫৯

www.pathagar.com

- স্বামীর দীনদারীও স্ত্রীর দীনদারীর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
- একজন দীনদার স্ত্রী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ।
- দীনদারীর বিষয়টি যথার্থভাবে বিবেচনা না করলে বৈবাহিক সম্পর্ক সুখের হয় না।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ হাদীসের দিক নির্দেশনাগুলো মেনে নিয়ে সুখী সমৃদ্ধশালী পরিবার ও শান্তিময় সামাজিক জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন।।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা